Approved by the Central Text Book Committee.

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

(বালকবালিকাদিগের জন্য)

শ্রীহেমলতা দেবী কর্ত্তৃক রচিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা,

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে
শ্রীকার্ত্তিকচরণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

১৯০২।

মূল্য ।৶০ দশ আনা।

ভূমিকা।

প্রায় এক বৎসর হইল আমার পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে বালকবালিকাদিগের জন্য একখানি ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতে আদেশ করেন। আমি তদবধি এই ইতিহাসখানি লিখিতে আরম্ভ করি। এক্ষণে বালকবালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক হইবার আশায় পুস্তকখানি মুদ্রিত করিলাম।

বাল্যকালে এত যে ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন দেখিতেছি, ইতিহাস ত কিছুই শিখি নাই। অধিকাংশ ইতিহাসের ভাষা এত দুরূহ যে, ইতিহাস বুঝিব কি, ভাষা বুঝিতেই মস্তক ঘুরিয়া যাইত। মনে করিতাম, রাজাদিগের নাম, যুদ্ধের শাল এবং কোন্ পক্ষ জয়ী হইল, জানাই বুঝি ইতিহাস পড়িবার ফল। বুদ্ধদেবের মাতার নাম মায়াদেবী না মহামায়া ছিল, সেই মীমাংসা লইয়াই ব্যস্ত হইতাম;—ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ ছিল, তাহা শিখি নাই। মুসলমান রাজাদিগের নাম ও রাজ্যকাল প্রাণপণে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম; মুসলমান-দিগের সময়ে এদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা ত বুঝি নাই। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ, তাহার কারণ এবং ফলাফলের কথা যত্ন পূর্ব্বক শিখিয়াছিলাম;—কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রতাপের কথা তত বুঝি নাই। এখন দেখিতেছি, রাজাদিগের নাম, শাল, যুদ্ধ ইত্যাদি কণ্ঠস্থ করিয়া কেবল স্মৃতিশক্তির অপব্যবহার করিয়াছি, ইতিহাস পাঠের সুফল লাভ করিতে পারি নাই। সরল ভাষায়, সরল ভাবে প্রকৃত ইতি-হাস সুকুমারমতি বালকবালিকাদিগকে শিখাইবার জন্য এই ইতিহাস-খানি লিখিয়াছি। ভাষা আরও সরল হইলে ভাল ছিল, কিন্তু সাধারণের মনোমত হইবে না, এই ভয়ে আরও সরল করিতে পারি নাই।

গ্রন্থখানি যদি টেক্‌ষ্ট-বুক্‌-কমিটি পাঠ্য-পুস্তক শ্রেণীভুক্ত করেন, তাহা হইলে ইতিহাসখানি সচিত্র করিবার ইচ্ছা আছে।

১৯এ মার্চ্চ, ১৮৯৮। — গ্রন্থকর্ত্রী।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

আমার প্রথম প্রকাশিত পুস্তকখানি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিয়া টেক্‌ষ্ট বুক্‌ কমিটি পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। তাহাদের মনোনীত পুস্তকখানিই পুনর্মুদ্রিত হইল। পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র-চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই পুস্তকের হিন্দু-রাজত্বকাল, এবং মৌলবী আব্দুল করিম বি, এ মহাশয় ইহার মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বকাল বিশেষ যত্ন সহকারে দেখিয়া দিয়াছেন। মৌলবী মহাশয়ের উপদেশানুসারে এই পুস্তকের মুসলমান নামগুলি যথাসাধ্য শুদ্ধ করিয়া লেখা হইয়াছে। সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির উত্থান নামক অধ্যায়টী বিশেষভাবে দেখিয়া দিয়াছেন এবং মহারাষ্ট্রীয় নামগুলির উচ্চারণ তিনি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইঁহাদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

এই বারে গ্রন্থখানি যাহাতে নির্ভুল হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি, আশা করি, এই চেষ্টায় অনেক পরিমাণে সফল হইয়াছি।

আমার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে পুস্তকখানিতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর ছবি সন্নিবেশিত হইল।

৫ই আগষ্ট, ১৮৯৯। — গ্রন্থকর্ত্রী।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় সংস্করণের সহিত ইহার পাঠগত কোন বৈষম্য নাই। কেবল লর্ড কার্জ্জনের শাসন সময়ের ঘটনাগুলি বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ইহাতে লিপিবদ্ধ হইল।

বিলাতের সুবিখ্যাত প্রকাশক লংম্যান গ্রীন্ এণ্ড কোম্পানি এই ইতিহাসের ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমতী নাইট তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানিকে যে কোন ভাষায় অনুবাদ করিবার স্বত্ব উক্ত কোম্পানি আমার নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছেন। ভবিষ্যতে আর কেহ মৎপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনুবাদ প্রকাশ করিতে পারিবেন না।

২৮এ জানুয়ারি,
১৯০১।

গ্রন্থকর্ত্রী।

সূচীপত্র।

—০—

হিন্দু রাজত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধযুগ।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কোম্পানির রাজত্ব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

মহারাণীর রাজত্ব।

ভারতবর্ষ
অযোধ্যা
প্রয়াগ
নবদ্বীপ
তাম্রলিপ্ত
মহানদী
গোদাবরী
অন্ধ্র
বিজয়নগর
মাদুরা
কামরূপ

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের ইতিহাস।

হিন্দুরাজত্ব।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আদিম আর্য্য-জাতি—আমরা বাঙ্গালী, আমাদের দেশ বাঙ্গালা, উড়িয়াদের দেশ উড়িষ্যা, পঞ্জাবীদের দেশ পঞ্জাব ; কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের সকলেরই দেশ। এখন আমারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে বাস করি, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলি—আমাদের আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু এমন এক সময় ছিল, যখন আমাদের সকলের এক দেশ ও এক ভাষা ছিল। তোমরা সকলেই জান, ইংরেজেরা আমাদের দেশের লোক নহেন, তাঁহাদের দেশ বিলাত, আমাদের সম্রাটও ইংরেজ, তিনি বিলাতে থাকেন। ইঁহারা আমাদের দেশ জয় করিয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছেন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, ইংরেজদের মত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণও এ দেশ জয় করিয়া, এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন ; কিন্তু সে অনেক দিনের কথা। পাঁচ ছয় হাজার বৎসরেরও পূর্ব্বের কথা বলিতেছি।

পণ্ডিতেরা বলেন যে, এ দেশে আসিবার পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ মধ্য-আসিয়ার কোন স্থানে বাস করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে আর্য্য বলিতেন। সে সময়ে কৃষিকার্য্য পশুপালন তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল, এবং তাঁহারা অনেকটা যাযাবর অবস্থাতে ছিলেন ;

অর্থাৎ আপনাদের স্ত্রী, পুত্র ও পশুদল লইয়া সর্ব্বদা এক স্থান হইতে অপর স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তৎপরে কি কারণে বলিতে পারি না, ইহাঁরা এক এক দল বাঁধিয়া এক এক দেশে গিয়া, সে দেশ জয় করিয়া তথায় বাস করেন। এখন ইহাঁরা পরস্পরকে ভিন্ন জাতীয় মনে করেন ও পরস্পরে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলেন বটে,—এমন কি একে অন্যকে ঘৃণা করেন, কিন্তু পূর্ব্বে সকলে এক জাতীয় ছিলেন ও এক ভাষায় কথা বলিতেন। এই আর্য্য-জাতীয়েরাই এখন পৃথিবীর মধ্যে বড় জাতি ইহাঁরা বুদ্ধিতে, বাহুবলে সকলের শ্রেষ্ঠ। ভারতের হিন্দুরা, বিলাতের ইংরেজেরা, ইউরোপের অনেক জাতীয় লোক— আর্য্যসন্তান ইহাঁরা সকলে পরস্পরের ভাই। কিন্তু আফ্রিকার কাফ্রিরা চীনেরা, তাতারেরা, জাপানীরা আর্য্য জাতীয় নহেন।

এই যে মধ্য আসিয়ার আর্য্য-জাতীর কথা বলিলাম, ইহাদেরই একদল ভারতের উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া, এ দেশ অধিকার করেন। পঞ্জাব তাঁহাদের আদিম বাসস্থান। পঞ্জাব নাম তাঁহারাই রাখেন—পঞ্জাবের অর্থ—পঞ্চ অপ্ অর্থাৎ পাঁচ জলস্রোত বা নদী যে দেশে আছে। পঞ্জাবের সেই পাঁচ নদীর কথা তোমরা নিশ্চয় ভুগোলে পড়িয়াছ।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে আসিয়া এ দেশে এক জাতীয় লোক দেখেন; তাহারা কৃষ্ণবর্ণ খর্ব্বাকৃতি, খাঁদা ও অসভ্য ছিল। তাহাদিগকে তাড়াইয়া আর্য্যেরা এ দেশ জয় করেন। এই কাল লোকেরা যদিও খুব অসভ্য ছিল, তথাপি সহজে আর্য্যদিগকে স্বদেশ ছাড়িয়া দেয় নাই। কত শত বৎসর ধরিয়া যে, তাহারা আর্য্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে তাহার ঠিক নাই, তাহারা শেষে যুদ্ধে না পারিয়া, দেশ ছাড়িয়া দিয়া, জঙ্গলে পর্ব্বতে আশ্রয় লইয়াছে, তথাপি সহজে অধীনতা স্বীকার করে নাই। শেষে তাহাদের মধ্যে অনেকে আর্য্যদের দাস হইলেও অধিকাংশ দাসত্ব

স্বীকার করে নাই। অনেকে অনুমান করেন, এখন যে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্ব্বতে জঙ্গলে ভীল কোল প্রভৃতি অসভ্যজাতীয় লোক

আদিম অসভ্য জাতি।

দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই এদেশের আদিম অধিবাসীদের সন্তান। পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ তাহাদিগকে যে অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, এখনও আমরা তাহাদিগকে প্রায় সেই অবস্থাতে দেখিতেছি। এই সময়ের ভিতরে পৃথিবীর কত জাতি উন্নত হইয়া আবার ধ্বংস পাইয়াছে, কিন্তু ইহাদের উন্নতিও হইল না এবং ধ্বংসও হইল না। হিন্দু রাজত্ব শেষ হইল, মুসলমানেরা এদেশের রাজা হইলেন; তারপর আবার ইংরেজেরা আসিলেন, কিন্তু ঐ ভীল কোলেরা যেমন ছিল, প্রায় তেমনিই রহিল—তাহাদের কোন প্রকার

বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। কেন এরূপ হইল ইহা ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। যাহাহউক এই অসভ্য জাতীয়দিগকে লইয়া আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে অনেক কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আর্য্যেরা ইহাদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। সর্ব্বদাই ইহাদের বিনাশের জন্য দেবতার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করিতেন।

ঋগ্বেদ—আর্য্যজাতির কোন বিশেষ ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু অত্যন্ত পুরাকাল হইতে তাঁহারা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে আর্য্য-জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনেক সংগ্রহ করা যায়। ঋগ্বেদ কি জান? এদেশে আসিবার পর আর্য্যেরা যে সকল গান রচনা করিয়াছিলেন ঋগ্বেদে তাহাই আছে। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইহা রচিত হইয়াছিল। পণ্ডিতেরা বলেন যে, আর্য্যদিগের ঋগ্বেদের ন্যায় পুরাতন গ্রন্থ আর পৃথিবীতে নাই। ইহার ভাষা এখনকার সংস্কৃত ভাষার মতও নহে। গ্রন্থখানি নিতান্ত ছোটও নহে, ইহাতে এক হাজার চব্বিশটি স্তোত্র আছে, দশ হাজারের বেশী ছন্দ আছে। ঋগ্বেদ আর্য্যদিগের পবিত্র শাস্ত্র। আজ পর্য্যন্ত হিন্দু সন্তানগণ বেদকে অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাণী বলিয়া বিশ্বাস করেন। ঋগ্বেদের স্তোত্র যাঁহারা রচনা করিতেন, তাঁহাদিগকে ঋষি বলে। মেয়েরাও ঋষি হইতেন। হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন যে, ঋষিগণ ঋগ্বেদের মন্ত্র রচনা করেন নাই, এ সকল মন্ত্র তাঁহাদিগের নিকট স্বতঃই প্রতিভাত হইয়াছিল। ঋগ্বেদে আমরা অনেক দেব দেবীর নাম দেখিতে পাই;—ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, বায়ু, সবিতা (সূর্য্য) মারুত ইত্যাদি। এই সকল দেবতার নাম দেখিয়া এবং ঋগ্বেদের মন্ত্র সকল পড়িয়া, আমরা বুঝিতে পারি যে, আর্য্যেরা প্রকৃতিতে যা কিছু সুন্দর, যা কিছু মহান্, যা কিছু শক্তিশালী, যা কিছু উপকারী দেখিতেন, তাহাতেই ভগবানের অধিষ্ঠান ভাবিয়া, ভক্তিভরে পূজা করিতেন। অনন্ত সুন্দর আলোকপূর্ণ আকাশকে তাঁহারা দ্যৌ বলিয়া পূজা করিতেন।

ঋগ্বেদের একটী গান দিতেছি ;—"হে ক্ষেত্রের রাজা, গাভীর দুগ্ধের ন্যায় নবনীত সমান সুখকরী বারিধারা আমাদের উপর বর্ষণ কর। হে জলের দেবতা, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। বৃক্ষ সকল আমাদিগের নিকট সুখকর হউক, আকাশ, বারিধারা, পৃথিবী সকল সুখময়ী হউক ; ক্ষেত্রের রাজা আমাদের প্রতি প্রসন্ন হউন ; শত্রুর আঘাত হইতে অক্ষত থাকিয়া আমরা তাঁহার দিকে চলি।" দেখ কেমন সুন্দর কথা! তাঁহারা প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে কত ভক্তি করিতেন, কত ভাল বাসিতেন ; তখনকার আর্য্যদের প্রাণ কেমন সরল, স্বাভাবিক, সুন্দরভাবে পূর্ণ ছিল।

বৈদিক ধর্ম্ম—ঋগ্বেদে আমরা যে ধর্ম্মের আভাস পাই, তাহাকেই বৈদিক ধর্ম্ম বলিতেছি। ঋষিরা যখন যে দেবতার পূজা করিতেন, তাহাতেই এমন তন্ময় হইয়া যাইতেন যে, সে সকল স্তব স্তুতি পড়িলে মনে হয়, তাঁহারা এক ভিন্ন দ্বিতীয় দেবতা জানিতেন না। ঋগ্বেদের একটী মন্ত্রে আছে ;—

সেই যে সত্য বাক্য—আকাশ এবং দিবা যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে, বিশ্ব ভুবন এবং প্রাণিগণ যাঁহার আশ্রিত, যাঁহার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উদিত হইতেছেন, সেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করেন।

ঋগ্বেদের সময় পঞ্জাববাসী আর্য্যদের আচার ব্যবহার—গো মেষ আর্য্যদের প্রধান সম্পত্তি ছিল। ঋগ্বেদ পড়িলে জানা যায়, তাঁহারা সর্ব্বদাই গো মেষদিগের জন্য দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন, তাহারা যেন আহার পায়, তাহারা যেন ভাল থাকে।

যথা ;—"ধেনুগণ, তোমাদের বৎস হউক। তোমরা সুন্দর শস্য ভক্ষণ কর, সুগম সরোবরে জল পান কর। তস্কর যেন তোমাদিগকে অধিকার না করে ; হিংস্র জন্তুও যেন তোমাদিগকে আক্রমণ না করে ;

এবং রুদ্রঅস্ত্র যেন তোমাদিগের দূরে থাকে।” আর্য্যেরা দেখিতে খুব সুন্দর ছিলেন, তাঁহাদের শরীরে খুব বল ছিল। তাঁহারা সবল, সাহসী, সত্যবাদী লোক ছিলেন ; কাহারও পদানত ছিলেন না। অসভ্য জাতীয়দিগের সহিত তাঁহারা ত সর্ব্বদাই যুদ্ধ করিতেন ; তীর ধনুক, তলোয়ার বর্ষা প্রভৃতি তাঁহাদের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র ছিল। আর্য্যেরা সর্ব্বদাই নৌকায় চড়িয়া দেশ বিদেশে ব্যবসা করিতে যাইতেন। ঋগ্বেদে আছে ;—“বরুণদেব ও আমি যখন নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রে যাই, তখন আমি কত সুখে জলের উপর ভাসি, কত সুখে তরঙ্গে দোল খাই।” আর্য্যেরা আহারের জন্য শস্য পিষিয়া রুটী প্রস্তুত করিতেন ; জঙ্গলের ফল মূল ভালবাসিতেন ; তদ্ভিন্ন ছাগ মেষ প্রভৃতি গৃহ-পালিত পশুদের মাংসও আহার করিতেন ইহা ভিন্ন সোমরস নামে একপ্রকার মাদক দ্রব্য তাঁহারা পান করিতেন। দুগ্ধের সহিত সোম নামক লতার রস মিশাইয়া এই পানীয় প্রস্তুত হইত। তাঁহারা সোমরস দিয়া দেবতার পূজা করিতেন। তখন এখনকার মত গাড়ী ছিল না বটে, কিন্তু তাঁহাদের যে এক রকম গাড়ী ছিল; তাহাকে রথ বলিত। তাহা ঘোড়ায় টানিয়া লইয়া যাইত। যুদ্ধের সময়ে তাঁহারা রথে চড়িয়া যাইতেন। বীর্য্যবান পুত্রলাভ করা আর্য্যেরা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয় মনে করিতেন ; “হে অগ্নি, আমরা যেন যজ্ঞকারী সুচেতাঃ পুত্র লাভ করিতে পারি”এই বলিয়া দেবতার নিকট প্রার্থনা করিতেন। আর্য্যেরা বিবাহের সময় ঘরে এক পবিত্র অগ্নি জ্বালিতেন, চিরদিনই সেই আগুন জ্বালাইয়া রাখিতেন, কখনও তাহা নিবিতে দিতেন না। স্বামী স্ত্রী এক সঙ্গে দেবতার পূজা করিতেন। বিবাহের সময় পিতাই কন্যাকে দান করিতেন। সাধারণলোকে প্রায় একটি বিবাহ করিত, ধনীরা বেশী করিতেন। পিতার সম্পত্তি পুত্রই পাইত, কন্যা পতিকুলে বাস করিত।

সিন্ধু তীরে যখন আর্য্যেরা ছিলেন, তখন তাঁহাদের অবস্থা অনেকটা

এইরূপ ছিল। তার পর ক্রমে তাঁহাদের বংশ ও বল বাড়িতে লাগিল, এবং তাঁহারা ক্রমশঃ গঙ্গার উপকূলস্থ দেশ সকল জয় করিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গঙ্গাতীরে আর্য্যজাতির অধিকার স্থাপন—আর্য্যদের ভারতবর্ষে আসিবার পরে বহু শতাব্দী পঞ্জাবেই কাটিয়া গেল। তারপর ক্রমশঃ তাঁহাবা আরও নূতন নূতন দেশ অধিকার করিতে লাগিলেন। একবার বর্ত্তমান সময়ের ভারতবর্ষেব মানচিত্র দেখ-দেখি, তারপর সেই সময়ের যে মানচিত্র তাহাও দেখ। শতদ্রু নদী পার হইয়া, আর্য্যেরা ক্রমে গঙ্গা, যমুনার উপকূলে নূতন রাজ্য সকল প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন। তখন যে সকল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কুরু ও পঞ্চাল রাজ্যের নাম আমরা আজ পর্য্যন্ত শুনিতে পাই। এই দুই রাজ্যের রাজাদের অত্যন্ত প্রতাপ ছিল। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে; তাহা হইতে আমরা সেই সময়ের বৃত্তান্ত অনেকটা জানিতে পারি। এখানকার যে দিল্লী সহর, তারই কাছে তখনকার কুরু রাজ্য ছিল; এখনকার কান্যকুব্জের কাছে তখনকার পঞ্চাল রাজ্য ছিল। এই দুই রাজ্যের রাজারা অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ বন্ধুভাবে ছিলেন; পরস্পরের সঙ্গে কোন বিবাদ বিসম্বাদ

ছিল না। পরে তাঁহাদের ভিতর ভয়ানক শত্রুতা জন্মে। দুই দলে ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া যায়। মহাভারতের যে গল্প—তাহা প্রধানতঃ এই যুদ্ধের কথা লইয়াই রচিত হইয়াছিল। মহাভারতের গল্প সংক্ষেপে বলিতেছি।

কুরুবংশে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই ভাই জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্র বড় ও পাণ্ডু ছোট। কিন্তু বড় ভাই জন্মান্ধ বলিয়া ছোট ভাই পাণ্ডু রাজা হন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত ও পাণ্ডুর পাঁচটী পুত্র ছিল। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদের নাম দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ইত্যাদি এবং পাণ্ডুর পুত্রদের নাম যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা কৌরব ও পাণ্ডুর পুত্রেরা পাণ্ডব নামে খ্যাত। পাণ্ডুর দুই স্ত্রী ছিল, কুন্তী ও মাদ্রী; যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন কুন্তীর পুত্র, এবং নকুল ও সহদেব মাদ্রীর পুত্র। কৌরবদের মাতার নাম গান্ধারী ছিল। পাণ্ডু যদিও রাজা হইয়াছিলেন, কিন্তু অধিক দিন রাজত্ব করিতে পান নাই। অচিরে তাঁহার মৃত্যু হইল। তখন পাণ্ডবেরা সকলে ধৃতরাষ্ট্রের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ধৃতরাষ্ট্র আপনার শত পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের শিক্ষার ভার দ্রোণাচার্য্যের হস্তে দিলেন। বীর দ্রোণ অতি যত্নের সহিত রাজপুত্রদিগকে অস্ত্রশিক্ষা দিতে লাগিলেন; এবং কিছু দিনের মধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, অস্ত্র-শিক্ষায় অর্জ্জুনের সমকক্ষ আর কেহই নাই। কাজেই অর্জ্জুন দ্রোণের অতি প্রিয় হইয়া উঠিলেন। ভীমের শরীরে অত্যন্ত বল ছিল; তাঁহার সহিত বলে কেহই পারিত না; এক ভীমের জ্বালায় শত কৌরব অস্থির হইয়া উঠিত; কাজেই ভীমকে সকলেই ভয় করিত। কৌরবদের শরীরে বল থাক আর নাই থাক, দুষ্ট বুদ্ধিতে কেহই তাহাদের সমান ছিল না। তাহারা সর্ব্বদাই পাণ্ডবদিগের অনিষ্ট চেষ্টা করিত! একদিন সকলে মিলিয়া জলক্রীড়া করিতে গিয়া বিষ খাওইয়া, ভীমকে ডুবাইয়া দিয়াছিল; ভীম কিন্তু তাহাতে

মরেন নাই। শেষে পাঁচটী ভাইকে মারিয়া ফেলিবার জন্য দুর্য্যোধন এক কৌশল করিল। জতু গৃহ করিয়া তাহার মধ্যে পঞ্চ পাণ্ডবকে লইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া, তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিবে স্থির করিল। কিন্তু পাণ্ডবেরা আগেই তাহা জানিতে পারিয়া লুকাইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিল, পঞ্চপাণ্ডব নিপাত হইয়াছে; ওদিকে পঞ্চপাণ্ডব ব্রাহ্মণের বেশে লুকাইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে দ্রুপদ রাজার কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর উপস্থিত। আকাশে মাছ থাকিবে, নীচে জলের ভিতর ছায়া দেখিয়া, যে সেই মাছের চোকে বাণ মারিতে পারিবে, সেই দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবে, এই পণ ছিল। দেশ দেশান্তরের অনেক রাজা ও রাজপুত্র উপস্থিত হইলেন। একে একে সকলেই চেষ্টা করিল, কিন্তু কেহই মাছের চোকে বাণ বিদ্ধ করিতে পারিল না; তখন ব্রাহ্মণ-বেশধারী অর্জ্জুন লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন। সভার মধ্যে চারিদিকে ধন্য ধন্য রব পড়িয়া গেল। প্রথমে অর্জ্জুনকে কেহই চিনিতে পারেন নাই, শেষে পাণ্ডবেরা পরিচিত হইয়া পড়িলেন। মহাভারতে এরূপ লেখা আছে যে, তাঁহারা পাঁচ ভাই মিলিয়া দ্রৌপদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র তখন পাণ্ডবদিগকে ডাকিয়া অর্দ্ধেক রাজ্য ভাগ করিয়া দিলেন, হস্তিনাপুরে তাঁহাদের রাজধানী হইল। যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করেন। পাণ্ডবদের যশঃ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। আবার দুর্য্যোধনের হৃদয় হিংসায় ফাটিয়া যাইতে লাগিল। আবার পাণ্ডবদিগের সর্ব্বনাশ করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। দুর্য্যোধনের এক মামা ছিল, তাহার নাম শকুনি। সেই শকুনির পরামর্শে যুধিষ্ঠিরকে পাশা খেলায় নিমন্ত্রণ করা হইল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুধিষ্ঠিরকে খেলিতে হইল। তিনি বাজি রাখিয়া ক্রমাগতই হারিতে লাগিলেন; ধন সম্পদ রাজ্য, একে একে সবই হারিলেন; নিজ ভ্রাতাদিগকে পণ রাখিলেন, তাহাও গেল। আপনাকে পণ

রাখিলেন তাহাও গেল। অবশেষে দ্রৌপদীকে পণ রাখিলেন, তাহাও গেল। পণে হারাতে দ্রৌপদী কৌরবদিগের ক্রীতদাসী হইলেন। দুর্য্যোধন ভাবিল বড় সুযোগ উপস্থিত! দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে অপমান করিতে হইবে। এই ভাবিয়া চুলে ধরিয়া সভা মধ্যে আনিয়া অপমান করা হইল। স্বামীরা লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলেন। পাশা খেলার পরিণাম এই হইল যে, পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসরের জন্য রাজ্য হইতে তাড়িত হইলেন; এবং স্ত্রীকে লইয়া বনে গেলেন। বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাত বাসের পর পাণ্ডবেরা ফিরিয়া আসিয়া রাজ্য চাহিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র ভূমি দিবেন না, এইরূপ বলিলেন। অগত্যা যুদ্ধ বাধিল। পানিপথের নিকট কুরুক্ষেত্রে আঠার দিন যুদ্ধ হয়; স্বয়ং কৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহায় ছিলেন। যুদ্ধে কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবপক্ষের মহাবীর সকল প্রাণ হারাইলেন; শত কৌরবেরও প্রাণ গেল, ইহা ভিন্ন রণক্ষেত্রে কত বীরের প্রাণ যে গেল, তাহার গণনা হয় না। চারিদিক্ শ্মশান হইল; বিধবাদের হাহাকারে আকাশ ফাটিয়া গেল। এই সকল দেখিয়া ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রাণ শোকে আকুল হইল এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছত্রিশ বৎসর পরে, কৃষ্ণের মৃত্যুতে অত্যন্ত খিন্ন ও আর রাজ্য করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, তিনি স্ত্রী ও ভ্রাতাদিগকে লইয়া হিমালয়ের পরপারে প্রস্থান করিলেন।

কুরু ও পঞ্চাল রাজ্য ছাড়া আমরা এই সময়ে কোশল, বিদেহ ও কাশী বলিয়া আরও তিন রাজ্যের কথা শুনিতে পাই। এখনকার অযোধ্যার কাছে তখনকার কোশল রাজ্য ছিল; ত্রিহুতের কাছে বিদেহ, এবং কাশীর কাছে কাশী রাজ্য ছিল। এই অযোধ্যার রাজাদের গল্প রামায়ণে আছে। দশরথ নামে অযোধ্যায় একজন রাজা ছিলেন; তাঁহার তিন প্রধানা রাণী ছিলেন; কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা। রাম

বড় রাণী কৌশল্যার পুত্র; ভরত কৈকেয়ীর পুত্র, এবং সুমিত্রার দুইটী পুত্র ছিল, তাহাদের নাম লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন। লক্ষ্মণ রামকে বড় ভাল বাসিতেন, সর্ব্বদাই তাঁহার কাছে কাছে থাকিতেন এবং শত্রুঘ্ন ভরতের অনুগত ছিলেন। তাহা ছাড়া চারিটী ভাইয়ে খুব ভাব ছিল; আর রামকে সকলেই খুব ভক্তি করিতেন ও ভাল বাসিতেন। রাজা দশরথ ক্রমে বৃদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্থির করিলেন যে, রামকে রাজ্য দিয়া অবসর লইবেন। রামকে রাজা করিবার জন্য সকল আয়োজন হইতে লাগিল; প্রজাদের মহা আনন্দ; রাজ্যে খুব ধুমধাম পড়িয়া গেল। এমন সময়ে দশরথের মেজ রাণী কৈকেয়ী হরিষে বিষাদ ঘটাইলেন। তিনি একবার অত্যন্ত সেবা শুশ্রূষা করিয়া দশরথকে কঠিন রোগ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন, তখন রাজা তাঁহার প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কৈকেয়ী এত দিন সেই দুই বর চান নাই। এখন রাম রাজা হইবেন এই কথা শুনিয়া, হঠাৎ সেই দুটী বর চাহিয়া বসিলেন। এক বর এই যে, ভরত যেন রাজা হন এবং অপর বর এই যে, রাম যেন চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য বনে যান। কৈকেয়ী কিন্তু রামকে বরাবর খুব ভাল বাসিতেন। কৈকেয়ীর কুব্জা নামে একজন দাসী ছিল, সে ভয়ানক দুষ্টা; সেই কুব্জা নানা প্রকারে কৈকেয়ীকে বুঝাইয়া এই দুইটী নিষ্ঠুর বর লইবার জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করে। সে কালের লোকেরা অত্যন্ত সত্যবাদী ছিলেন; প্রাণ গেলেও মিথ্যা কথা বলিতেন না, বা সত্যভঙ্গ করিতেন না। রাজা দশরথ একবার যাহা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিতে পারিলেন না; কাজেই রামকে বনে যাইতে হইল। রামের প্রকৃতি এমন চমৎকার ছিল যে, রাজ্য শুদ্ধ লোক এই সংবাদে হাহাকার করিতে লাগিল; ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। ওদিকে রাজা দশরথ রামকে বনে যাইতে হইবে ভাবিয়া, শোকে

অচেতন হইলেন এবং রাম বনে গমন করিলেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কিন্তু রাম আনন্দচিত্তে পিতৃসত্য পালন করিতে গেলেন। তিনি বিদেহ-রাজ জনকের কন্যা সীতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। রাম বনে যাইবেন শুনিয়া, সীতা এবং লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। রাম অনেক নিষেধ করিলেন, তাঁহারা কিছুতেই শুনিলেন না। তখন নাকি লঙ্কা দ্বীপে রাক্ষসেরা বাস করিত, লঙ্কার রাজা রাবণ যেমন দুর্বৃত্ত, তেমনই বলবান ছিল। সে পঞ্চবটী নামক বন হইতে রামের অনুপস্থিতিকালে সীতাকে চুরি করিয়া লইয়া গেল। রাম সাগরে সেতু বাঁধিয়া অনেক যুদ্ধ করিয়া রাবণকে মারিয়া, সীতাকে উদ্ধার করেন এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের পর লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু অভাগিনী সীতার ভাগ্যে সুখ ছিল না। এত দিনের পর যদি বা স্বামীকে পাইলেন, তবে আবার লোকের নিন্দা শুনিয়া রাম তাঁহাকে বনে পাঠাইলেন। সেখানে সীতার লব ও কুশ নামে দুইটী যমজ পুত্র হয়। এই গেল রামায়ণের গল্প। যে গ্রন্থে এই গল্প আছে তাহার নাম রামায়ণ। ইহা বাল্মীকি নামে এক ঋষির প্রণীত। এই রামায়ণ হিন্দুজাতির বড় প্রিয়। ইহাতে আমরা অনেক উপদেশ পাই। রামের পিতৃভক্তি, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃপ্রেম, দশরথের সত্যপ্রিয়তা এবং সীতার সতীত্বের দৃষ্টান্ত বড়ই উজ্জ্বল। রামায়ণের উল্লিখিত ঘটনাগুলি মহাভারতের উল্লিখিত ঘটনার অনেক পূর্ব্বকালবর্ত্তী এই তিন হাজার বৎসর, এই সকল অপূর্ব্ব কাহিনী ভারতবাসী সকলে কণ্ঠস্থ করিয়া আসিতেছে। আজ পর্য্যন্ত এমন লোক প্রায় ভারতবর্ষে নাই, যে রামায়ণের গল্প জানে না; কোটী কোটী ভারতসন্তান আজও সীতার পতিপরায়ণতা ও দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া চক্ষের জল ফেলে। সীতা আর্য্য-নারীর সতীত্বের আদর্শ।

আগেই বলিয়াছি, সীতা বিদেহ-রাজ জনকের দুহিতা। তাই সীতার অপর নাম বৈদেহী। রাজা জনক অতি ধার্ম্মিক এবং মহা জ্ঞানী

ছিলেন ; তাই তাঁহাকে রাজর্ষি জনক বলে। যখন জনক বিদেহ রাজ্যে রাজত্ব করিতেন, তখন কাশী রাজ্যে অজাতশত্রু নামে একজন পণ্ডিত রাজা রাজত্ব করিতেছিলেন। দুই জনেই শাস্ত্রালোচনা করিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। দেশের যত পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোক ইঁহাদের সভা উজ্জ্বল করিয়া থাকিতেন। রাজা জনক সর্ব্বদাই অতি গভীর ধর্ম্মের কথা আলোচনা করিতেন ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে এ বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ আছে।

তোমরা কুরু, পঞ্চাল, কোশল, বিদেহ ও কাশী রাজ্যের কথা কিছু কিছু শুনিলে ; এখন একবার মানচিত্রের দিকে চাহিয়া, এই সকল রাজ্য দেখ দেখি। আগে ছিলেন আর্য্যেরা সিন্ধুতীরে, পঞ্চনদ দেশে, এখন আসিলেন গঙ্গা যমুনার উপকূলে, অর্থাৎ এখন আমরা যাহাকে উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ বলি সেইখানে। ভারতবর্ষে আর্য্যদের আগমনের বহুকাল পরে এই সকল রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

তখনকার পণ্ডিতেরা যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া আমরা সেই সময়ের লোকদের কথা অনেকটা জানিতে পারি। গঙ্গাতীরবাসী আর্য্যদিগের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন জাতির সৃষ্টি হইয়াছিল। সম্ভবতঃ যাঁহারা পূর্ব্বে পুরোহিতের কাজ করিতেন, এখন তাঁহারা ব্রাহ্মণ নামে ভিন্ন এক জাতি হইলেন ; যাঁহারা যুদ্ধ করিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন ; যাঁহারা কৃষি বাণিজ্য করিতেন, তাঁহারা বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন ; আর পরাজিত অসভ্য জাতিরা শূদ্র হইল। শূদ্রেরা উপরিতন তিন বর্ণের দাসত্ব করিত। তখন উচ্চজাতির পুরুষ নিম্ন-জাতির কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আর্য্যগণ পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্ব্বে আসিতে লাগিলেন; ভারতবর্ষে আসিবার এক হাজার বৎসর পরে, তাঁহারা মিথিলা প্রদেশে অর্থাৎ এখানকার বিহার অঞ্চল পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন; এবং ক্রমে বিন্ধ্যাচল পার হইয়া দক্ষিণাপথেও যাইতে লাগিলেন। তখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই অসভ্য জাতির বাস ছিল। অসভ্য জাতিদিগকে তাড়াইয়া, বন কাটিয়া, তাঁহারা গ্রাম ও সহর করিয়াছিলেন। আর অসভ্যদিগের মধ্যে যে সকল লোক তাঁহাদের অধীন হইল, তাহাদিগকে তাঁহারা আপনাদের ধর্ম্ম দিয়া, নিজ সমাজের অঙ্গীভূত করিয়া লইলেন এবং শূদ্র, এই নাম দিলেন। শূদ্রেরা ক্রীতদাসের মত হইল। এইরূপে ভারতবর্ষে এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য ও কত নূতন নূতন রাজ্য স্থাপিত হইতে লাগিল। সে সময়ে কোনও রাজ্যের রাজা খুব প্রতাপশালী হইলে, অন্য সকল রাজাকে পরাজয় করিয়া তিনি আপনাকে সকলের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিতেন। এইরূপে কখনও বা কুরু রাজ্য, কখনও বা কোশল রাজ্য, কখনও বা মগধ রাজ্য, এক এক সময়ে এক এক রাজ্য সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিত। এইরূপে ভারতবর্ষে ছোট বড় অসংখ্য রাজ্য স্থাপিত হইতে লাগিল। যখন বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন, তখন মগধ রাজ্যই সর্ব্বপ্রধান ছিল। বুদ্ধদেবের সময়ে বিম্বিসার নামক মহা পরাক্রান্ত এক রাজা মগধে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র অজাত-শত্রু প্রায় সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তকে একছত্র করিয়াছিলেন। অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর কয়েকজন রাজা হন; তাহার পর ৩৭০—৩২০ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত নন্দবংশীয় নয় জন রাজা মগধে রাজত্ব

করেন। শেষে নন্দের সময় ভুবনবিজয়ী গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসেন। তিনি শতদ্রু পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন; তাহার পর দেশে ফিরিয়া যান। আলেকজাণ্ডর যখন এদেশে ছিলেন, তখন মগধ রাজ্য হইতে চন্দ্রগুপ্ত নামে একজন অতিশয় বুদ্ধিমান্ লোক পলাইয়া তাঁহার নিকট যান; কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের ধৃষ্টতায় আলেকজাণ্ডর তাঁহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। অগত্যা সে ব্যক্তি সেখান হইতে চলিয়া আসে। আলেকজাণ্ডর চলিয়া গেলে, চন্দ্রগুপ্ত পঞ্জাব হইতে অনেক সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া চাণক্য পণ্ডিত নামক একজন অতিশয় বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণের সাহায্যে শেষ নন্দকে হারাইয়া মগধের রাজা হন। চন্দ্রগুপ্ত জাতিতে নীচ ছিলেন বলিয়া, সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিত; কিন্তু তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী রাজা আর কেহ মগধের সিংহাসনে বসেন নাই। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে সেই সময়ে মেগাস্থিনিশ নামক একজন গ্রীক, দূতের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাস করিতেন; তাঁহার রচিত গ্রন্থ হইতে আমরা মগধের সেই সময়ের সভ্যতা ও পরাক্রমের কথা জানিতে পারি। চন্দ্রগুপ্ত গ্রীকরাজা সেলিউকসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় প্রতাপশালী রাজা ছিলেন; তাঁহার নামে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত কাঁপিত। যদিও তাঁহার মাতা নীচ জাতীয়া ছিলেন এবং বল-পূর্ব্বক তিনি অন্যের সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, এমন সাহস কাহারও ছিল না। চন্দ্রগুপ্তের বুদ্ধি এবং ক্ষমতা অসাধারণ ছিল।

গ্রীক লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ—গ্রীকেরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়া গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহার বড় মূল্য। কারণ ভারতবর্ষের আদিম ইতিহাস জানা বড়ই কঠিন; তাহা ছাড়া যাহা জানা যায়, তাহার ভিতর কতটুকু সত্য কতটুকু মিথ্যা, ভেদ করা

যায় না। গ্রীকেরা বিদেশীয়, তাঁহারা আমাদের সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা বোধ হয়, অনেকটা ঠিক। গ্রীকেরা ভারতবর্ষে সাত রকম জাতি দেখিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয়, এই চারি জাতির রূপান্তর; তাঁহারা বিদেশীয় কিনা, তাই বুঝিতে পারেন নাই। গ্রীকেরা যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে প্রচারিত হইয়াছে; তাই বৌদ্ধ পুরোহিতদিগকে একটী ভিন্ন জাতি বলিয়া মনে করিয়া ছিলেন। গ্রীকেরা ব্রাহ্মণদের যে বর্ণনা করিয়াছেন, এখন খুঁজিয়া দেখিলে, সেই প্রকার ব্রাহ্মণ আর আমরা দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণেরা এক সময় বড়ই উচ্চ ছিলেন। গ্রীকেরা বলেন যে, ব্রাহ্মণেরা কেবল পড়াশুনা এবং ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা অর্থ উপার্জ্জন করিতেন না। রাজারা এবং দেশের ধনীরা তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। ব্রাহ্মণদিগকে সকলে অত্যন্ত সম্ভ্রম করিত, তাহাদিগের উপর রাজকর ছিল না। ব্রাহ্মণদিগের কঠোর তপস্যা দেখিয়া গ্রীকগণ মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে কোন দ্রব্য কিনিতে হইত না, যাহা ইচ্ছা হইত দোকান হইতে তুলিয়া লইতেন এবং বিক্রেতা আপনাকে কৃতার্থ মনে করিত। ব্রাহ্মণেরা যেখানে যাইতেন, লোকেরা তাঁহাদিগকে পূজা করিত। গ্রীকেরা হিন্দুদিগের বীরত্বের বড়ই প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা আসিয়ার যত জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, হিন্দুদিগের মত বীর কোথাও দেখেন নাই। তাঁহারা ভারতবর্ষের লোকদিগকে সবল, সাহসী, সত্যবাদী, পরোপকারী ও আতিথেয় বলিয়া অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, কি পরিবর্ত্তনই দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ যুগ।

বুদ্ধের জীবন—৫৫৭ পূঃ খৃঃ অব্দের একদিন ভারতের পক্ষে, ভারতের কেন, সমুদায় জগতের পক্ষে এক বিশেষ দিন গিয়াছে। ২৫এ ডিসেম্বরকে লোকে বড় দিন বলে, কেননা সে দিনে যীশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন; সেইরূপ বুদ্ধ যে দিনে পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সে দিনও এক বড় দিন। সেই দিন কপিলবাস্তু নগরের অদূরে লুম্বিনীর স্নিগ্ধ শ্যামল নিকুঞ্জে কপিলবাস্তুর রাজার অনেক তপস্যার ধন পুত্র সিদ্ধার্থ ভূমিষ্ঠ হইলেন।* মহারাজ শুদ্ধোদন ও মায়াদেবী পুত্র লাভের জন্য অনেক তপস্যা, অনেক দান ধ্যান করিয়াছিলেন, তথাপি বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঘর শূন্য ছিল। রাজা ও রাণী বড়ই মনের কষ্টে ধর্ম্ম কর্ম্ম লইয়া দিন কাটাইতেন। এমন সময়ে তাঁহাদের নিরানন্দ মনে আশার সঞ্চার হইল। মায়াদেবী পিতৃগৃহে যাইতেছিলেন, পথে লুম্বিনীর নিকুঞ্জে তাঁহার একটী সুন্দর শিশু ভূমিষ্ঠ হইল। রাজা শুদ্ধোদনের নিকট সংবাদ গেল। তিনি স্ত্রী ও পুত্রকে মহা সমারোহে কপিলবাস্তুতে লইয়া গেলেন। প্রজাদিগের নৃত্য, গীত, বাদ্য ও আনন্দ-কোলাহলে রাজধানী কাঁপিয়া উঠিল। শুদ্ধোদন ভাবিলেন তাঁহার বংশধর জন্মিয়াছে। কিন্তু তাঁহার বংশধর জন্মে নাই। দেবতাদের বংশধর তাঁহার তপস্যার ফলে তাঁহাদের ঘরে

---

* ভারতবর্ষের মানচিত্রে এখন যেখানে গোরক্ষপুর নামক নগর দেখা যায়, তাহার ৫০ মাইল উত্তরে কপিলবাস্তু নামে এক নগর ছিল। খৃষ্টের সাড়ে পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাণীর নাম মায়াদেবী।

জন্মিয়া তাঁহার বংশকে পবিত্র করিয়াছে। যাহা হউক পুত্রের মুখ দেখিয়া রাজা সকল দুঃখ ভুলিলেন, কিন্তু সাত দিনের মধ্যেই শিশু মাতৃহীন হইল। এত আনন্দের মধ্যে শোকের ছায়া পড়িল। শুদ্ধোদন অতিযত্নে শিশুটীকে পালন করিতে লাগিলেন ও তাহার নাম সিদ্ধার্থ রাখিলেন। যখন তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স, তখন যশোধরা নাম্নী একটী সুন্দরী রাজ-দুহিতার সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। কথিত আছে নানাপ্রকার বিষয়-সুখের মধ্যে নিরন্তর মগ্ন থাকিলেও সিদ্ধার্থের মন কিছুতেই আরাম পাইত না। আহার বিহারে, পোষাক পরিচ্ছদে তিনি কোন সুখ পাইতেন না। চারিদিকে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া, এই সকল আমোদের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। তিনি নির্জ্জনে বসিয়া ভাবিতেন, যখন পৃথিবীর অধিকাংশ লোক রোগ শোক, পাপ তাপে নিমগ্ন, তখন এ সকল আমোদ আহ্লাদে সুখ কি? রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এই বিষণ্ণভাব দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ছিলেন এবং কুমারের মন ভুলাইয়া রাখিবার জন্য নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন কিছুতেই শান্তি বা সুখ পাইত না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইবেন। একবার দেখিবেন, মানুষের দুঃখ দূর করিবার কোন উপায় ঠিক করিতে পারেন কি না। যদি তাহা নাও পারেন, তথাপি সেই সন্ধানে চিরজীবন কাটাইবেন। অবশেষে মানুষের দুঃখ কষ্ট দেখিয়া, তিনি কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুখে আহার নিদ্রা তাঁহার ভার বোধ হইল। তিনি সুখের রাজ্য, পিতা ও পত্নীর সহবাস পরিত্যাগ করিবেন, মনে মনে এই সঙ্কল্প করিলেন। এমন সময় তাঁহার একটী পুত্র জন্মিল। এক দিন নদীর তীরে চিন্তাকুল হইয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে, তাঁহার একটী পুত্র হইয়াছে, সিদ্ধার্থ বিষণ্ণভাবে বলিলেন,

তাই ত এ যে আবার নূতন বন্ধন। আনন্দের রোলে পুরী কাঁপিয়া উঠিল; কিন্তু সিদ্ধার্থের কাণে জগতের দুঃখী লোকের আর্ত্তনাদ বাজিতে লাগিল। আর তাঁহাকে কিছুতেই ভুলাইয়া রাখিতে পারা গেল না। যে জগতে এত দুঃখকষ্ট, সে জগতে থাকিয়া আনন্দ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া উঠিল। সেই দিনই গভীর রাত্রে যখন পুরীর সকল লোক ঘুমাইতেছে, তখন তিনি অতি ধীরে ধীরে তাঁহার স্ত্রীর ঘরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইলেন; দেখিলেন, পুত্র-কোলে যশোধরা ঘুমাইতেছেন, কি সুন্দর শিশু! সিদ্ধার্থের ইচ্ছা হইল, ছেলেটীকে চিরদিনের মত কোলে করিয়া, তাহাকে একটী চুম্বন করেন; কিন্তু পাছে যশোধরার ঘুম ভাঙ্গে, এই ভয়ে উদ্দেশ্যে ছেলেকে আদর করিয়া, মনে মনে স্ত্রীর নিকট বিদায় লইলেন। ধন সম্পদ্, আত্মীয় স্বজন সকলকে তিনি সেইখানে বিসর্জ্জন দিলেন। উদ্দেশে পিতার চরণে প্রণাম করিয়া, সিদ্ধার্থ চিরদিনের মত পিতার গৃহ, সংসারের সুখ, স্ত্রী পুত্র, রাজ্য, সকলই ছাড়িয়া চলিলেন।

সিদ্ধার্থ প্রথমে বৈশালী দেশে গিয়া একজন মহাপণ্ডিত ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন। তাঁহার নিকট হিন্দুশাস্ত্রের কথা অনেক শিখিলেন। পরে সেখান হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহে আর একজন ব্রাহ্মণের শিষ্য হইলেন। তাঁহার তৃপ্তি হইল না। দেখিলেন অনেক শাস্ত্র পড়িলে, অনেক জ্ঞানলাভ করিলেও প্রকৃত সুখ হয় না। বুঝিলেন, ঐরূপ জ্ঞানলাভ, মানুষের দুঃখ দূর করিবার ঠিক উপায় নহে। কাজেই পণ্ডিতদিগের সঙ্গ ছাড়িলেন। ভাবিলেন, দেখি কঠোর তপস্যা করিলে মনের সুখ পাই কিনা। এই ভাবিয়া বর্ত্তমান গয়া নগরীর নিকটস্থ উরুবিল্ব গ্রামের নিকটে এক নির্জ্জন বনে ভয়ানক কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অনাহারে, অনিদ্রায় শরীর ক্ষীণ হইতে

লাগিল। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে অগ্নি জ্বালিয়া, তন্মধ্যে বসিয়া জপ করিতেন, শীতের রাত্রে নিরঞ্জন নদীর জলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া
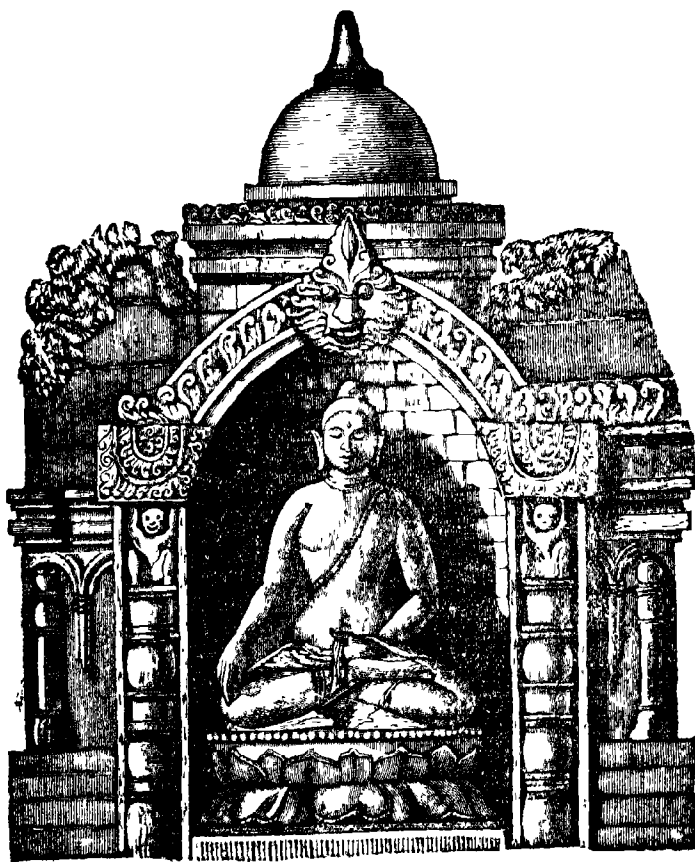
বুদ্ধদেব।

ধ্যান করিতেন। ক্রমে শরীর ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে ছয় বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে একদিন অচেতন হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার সঙ্গে যে পাঁচজন শিষ্য ছিল, তাহারা ভাবিল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। চেতনা পাইয়া তিনি মনে করিলেন, ছয় বৎসর ধরিয়া এত যে তপস্যা করিলাম, তবুও প্রাণে আরাম পাইলাম না কেন? এইরূপ কথিত আছে যে, তিনি এই সময় হইতে কঠোর তপস্যাকে বৃথা জানিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। তাহাতে তাঁহার পাঁচজন শিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি পুনবার একাকী সেই অরণ্য মধ্যে ঘোর সাধনাতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবিলেন, প্রাণ যাক্ আর থাক্, একবার দেখি মানবের মুক্তির কোন উপায় আছে কি না? একবার যে বসিব, জ্ঞানালোক না পাইলে উঠিব না। আমার অঙ্গ সকল শরীর হইতে খসিয়া পড়ুক, কীটে আমার শরীরকে মাটী করিয়া ফেলুক, তথাপি জ্ঞানালোক না পাইলে উঠিব না। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বৃক্ষতলে ধ্যানে বসিলেন। জগতে সেই বৃক্ষ বোধিবৃক্ষ নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই বৃক্ষতলে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন। যাহার অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহা পাইলেন। সেই দিব্যজ্ঞান পাইয়া, আপনাকে বুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। জগদ্বাসীকে শান্তির পথ দেখাইবার জন্য মহা আনন্দে লোকের নিকট ছুটিলেন। বুদ্ধদেব যখন বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন মগধ রাজ্য ভারতের প্রধান রাজ্য ছিল। মহারাজ বিন্দুসার সেই রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধদেবকে আপনার রাজধানী, রাজগৃহে ডাকিলেন এবং বুদ্ধ সেখানে গিয়া আপনার ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। বুদ্ধ দেশে দেশে ফিরিয়া ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ, শূদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলের নিকট নূতন ধর্ম্ম ঘোষণা করিলেন। অচিরে তাঁহার অনেক শিষ্য জুটিল। যে তাঁহার কথা শুনিল, সেই মোহিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্ম

প্রচার করিবার বার বৎসর পরে তিনি একবার স্বদেশে গেলেন; এবং স্বীয় পিতা, পুত্র ও প্রজাদের নিকট নূতন ধর্ম্মের কথা বলিলেন। তাঁহার পুত্র রাহুল ও তাঁহার স্ত্রী যশোধরা সর্ব্বত্যাগী হইয়া তাঁহার শিষ্য হইলেন। এইরূপে দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া, প্রায় আশি বৎসর বয়সে কুশীনগরের নিকট এক বনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

দেশের অবস্থা—জগতের সকল জাতির অতীত ইতিহাস পড়িলে একটী বিষয় দেখা যায় যে, যখনই কোন একটা যুগান্তরকারী বিশেষ ঘটনা ঘটে, তাহার ভিতর প্রচ্ছন্নভাবে অনেক দিন হইতে একটা কারণ বিদ্যমান থাকে। প্রথমে তাহা অল্পে অল্পে লোক-চক্ষুর অগোচর থাকিয়া কার্য্য করে। সেইরূপ বুদ্ধদেব যখন এদেশে অবতীর্ণ হইয়া বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচার করিলেন, তখন পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ একটা ঘটনার আভাস দেখা গিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম বৈরাগ্যমূলক। খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে হিন্দু-দর্শনে বিশেষতঃ কপিল-প্রণীত সাংখ্যে ঐ বৈরাগ্যবাদ ঘোষিত হয়। বুদ্ধের পিতার রাজধানী কপিলবাস্তু এই মহাত্মার নামেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং বুদ্ধের যে আশৈশব বৈরাগ্যের দিকে অনুরাগ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্রাহ্মণেরই কার্য্য, হিন্দু-শাস্ত্রের এই উপদেশ। কিন্তু বুদ্ধ ক্ষত্রিয় হইয়াও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তখনকার সময়েও ইহা নূতন ছিল না; কারণ সূত্রপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, সেই সময়ে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণ ধর্ম্মালোচনা করিতেন এবং শিষ্যদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। আবার হিন্দুশাস্ত্রানুসারে রাজপদ ক্ষত্রিয়েরই প্রাপ্য, অন্য জাতীয়ের রাজপদে অধিকার নাই। কিন্তু বুদ্ধদেবের সময়ে মগধের সিংহাসনে শূদ্র রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। সমাজ এবং দেশমধ্যে এই সকল ঘটনা সেই সময়কে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের উপযোগী করিয়া তুলিয়াছিল এবং এই সকল বিপর্য্যয়ের ফল স্বরূপ বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের দিকে

অনেকের গতি হইতে ছিল, তাহার ফল স্বরূপ দেখ সন্ন্যাসী বুদ্ধদেব। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর জাতীয়েরাও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার ফলস্বরূপ দেখ ক্ষত্রিয় বুদ্ধ ধর্ম্মোপদেষ্টা। তাহার পর মগধের সিংহাসনে এত বড় প্রতাপশালী শূদ্র রাজা না থাকিলে বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম্ম এরূপ ভাবে প্রচারিত হইত না।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম কি ?—বুদ্ধের প্রধান উপদেশ দুইটি; বাসনাবিলয় ও সর্ব্বভূতে মৈত্রী। পবিত্র জীবন লাভ করা এবং বাসনাশূন্য হওয়া, এই ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। মানুষ এক জন্মে না হউক, জন্মে জন্মে ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া, অবশেষে মুক্তি বা নির্ব্বাণ পাইতে পারে, তখন আর জন্ম হয় না। এই ধর্ম্মে সকল মানবের সমান অধিকার। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আর এক মূল-মন্ত্র সর্ব্বজীবে দয়া। সকল জীবের সেবা করা বৌদ্ধধর্ম্মের মহৎ উপদেশ। এমন কি তাহাদিগের সময়ে পশুদিগের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা পুরুষ যে একজন আছেন, বুদ্ধ সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম যে হিন্দুধর্ম্ম হইতে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বুদ্ধদেব যেরূপ ভাবে এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাহা এদেশের পক্ষে কিছু নূতন, বিশেষতঃ বিহার স্থাপন, এবং দেশ বিদেশে ধর্ম্ম-প্রচারের ভাব আমাদের দেশে ছিল না। ইহা বৌদ্ধধর্ম্মের এক নূতনত্ব। বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে ভিক্ষু আর স্ত্রীলোকদিগকে ভিক্ষুণী বলিত। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণ চিরজীবন মঠে বাস করিয়া বৈরাগ্য-ব্রত পালন করিতেন।

অশোকের জীবন—বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মগধরাজ অশোকের চেষ্টাতেই তাহা ভারতে এবং দেশ দেশান্তরে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল। এই অশোকের মত প্রতাপশালী রাজা আর কেহ ভারতে রাজত্ব করিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। ইহার জীবনের কাহিনী বড়ই সুন্দর।

আমরা পূর্ব্বে যে মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের কথা বলিয়াছি, অশোক তাঁহারই পৌত্র। যখন অশোকের পিতা বিন্দুসার পাটলিপুত্রের রাজা, তখন একদিন একটী ব্রাহ্মণ, কন্যাসহ আসিয়া তাহাকে বলিলেন যে, "মহারাজ! ভাগ্যবিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, আমার এই কন্যার গর্ভে রাজচক্রবর্ত্তী এক পুত্র জন্মিবে; আর আমার কন্যাটীও অতি সুন্দরী ও সুলক্ষণা; আমি অনুরোধ করি, আপনি ইহাকে রাজরাণী করিয়া লউন।" বিন্দুসার কন্যাটীকে রাজ-অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ইনিই অশোকের জননী। কথিত আছে, অশোক অত্যন্ত কুৎসিত ছিলেন। সেই জন্য তাঁহার পিতা তাহাকে ভাল বাসিতেন না। অশোকের আরও অনেক ভাই ছিল। এক দিন মহারাজ বিন্দুসার পুত্রদের শিক্ষক পিঙ্গলকে বলিলেন, "আমি জানিতে চাই পুত্রদের মধ্যে কে আমার সিংহাসন পাইবার উপযুক্ত। সেই কথা অনুসারে পিঙ্গল একদিন রাজকুমারদিগকে ডাকিলেন; সকলে নানা বেশ-ভূষা করিয়া বড় বড় গাড়ীতে চড়িয়া আসিল ও ভাল ভাল আসনে আসিয়া বসিল। কুৎসিত অশোককে কেহ দেখিতে পারে না, সে সামান্য পোষাক পরিয়া পিতার বৃদ্ধ হাতীতে চড়িয়া, আসিয়া, মাটিতে বসিল। রাজপুত্রেরা কত কি আহার করিল; অশোক মাতৃদত্ত চিড়া আর সামান্য জল পান করিল। বিন্দুসার যখন পুত্রদিগকে দেখিতে আসিলেন, তখন পিঙ্গল বলিলেন, "মহারাজ, ইহাদের মধ্যে যাহার ভাল আসন, ভাল বাহন ও ভাল পানীয় সেই রাজা হইবে।" সকল রাজপুত্রই ভাবিল সেই রাজা হইবে। অশোক* আসিয়া মাকে বলিল, "মা, আমিই রাজা হইব। আমি পিতার বৃদ্ধ হাতীতে চড়িয়া গিয়াছি, তাহার অপেক্ষা ভাল বাহন আর কাহার? আমি পৃথিবীর উপর বসিয়াছিলাম, তার অপেক্ষা ভাল আসন আর কাহার? আমি নির্ম্মল

* ২৬০ পূঃ খৃঃ অশোক রাজা হন। ২২৩ পূঃ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়।

জল পান করিয়াছি, তার চেয়ে ভাল পানীয় আর কাহার?” যাহা হউক পরে অশোকের কথাই ঠিক হইল। অশোক দেখিতে যে শুদ্ধ কদাকার ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার প্রকৃতিও অতি ভয়ানক ছিল। রাজা হবার পর তাঁহার দৌরাত্ম্যে প্রজারা অস্থির হইয়া উঠিল; তাঁহার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার সীমা পরিসীমা ছিল না। একবার ভাবিলেন, তিনি স্বয়ং ইন্দ্র। আর তাঁহার রাজধানী স্বর্গ। এই ভাবিয়া একটী দুর্গন্ধময় স্থান করিয়া তাহার নাম ‘নরক’ দিলেন। সেখানে এক জন ভয়ঙ্কর যমদূতের মত লোককে রাখিয়া বলিলেন, এখানে যে আসিবে তাহাকে অশেষ কষ্ট দিয়া মারিবে। একদিন একজন বৌদ্ধভিক্ষুক সেখানে ভিক্ষা করিতে আসিল; তাহার আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া যমদূত মহারাজকে গিয়া জানাইল। তাহার মুখে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্মের কথা শুনিয়া অশোক মুগ্ধ হইলেন। অশোক বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে অতি বিরল। বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াই অশোক তাঁহার রাজধানীতে বৌদ্ধদিগের এক মহাসভা ডাকিলেন; তাহার পর দেশদেশান্তরে প্রচারক পাঠাইতে লাগিলেন। কোথায় গ্রীস, কোথায় চীন, কোথায় জাপান, কোথায় সিংহল চারিদিকে প্রচারক পাঠাইলেন। তিনি সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ছিলেন; তাঁহার বিরুদ্ধে কথা বলে, এমন সাহস ভারতের কোন রাজার ছিল না। তিনি ভারতের সহরে সহরে ৮০,০০০ স্তূপ অর্থাৎ পাষাণ ও মৃত্তিকাময় ক্ষুদ্র গিরি করিয়া বুদ্ধের দেহভস্ম রাখিলেন। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পর্ব্বতে পর্ব্বতে ধর্ম্মের আদেশ সকল লিখিয়া রাখিলেন। ইহা ছাড়া কত পান্থশালা, কত হাঁসপাতাল, কত বিহার, কত মঠ করিয়াছিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অশোকের অনুশাসন সকল পড়িলে বুঝা যায়, কি মহৎ ভাবে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তাঁহার রাজ্যে কেহ জীবহত্যা

করিতে পারিত না। বৌদ্ধভিক্ষু ও ব্রাহ্মণদিগকে অশোক দুই হস্তে দান করিতেন। তাঁহার অসীম রাজশক্তি ও প্রভূত ঐশ্বর্য্য কেবল বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার ও বৌদ্ধভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের পালনের জন্য অকাতরে ব্যয় করিয়াছেন। এত দান করিয়াও তিনি তৃপ্ত হন নাই। শেষে রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিয়া স্বয়ং ভিক্ষু হইয়াছিলেন। অশোক একস্থানে লিখিয়াছিলেন যে, যতদিন চন্দ্র সূর্য্য থাকিবে ও যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন তাঁহার ধর্ম্ম ও তাঁহার নাম এ জগতে থাকিবে, হায়।
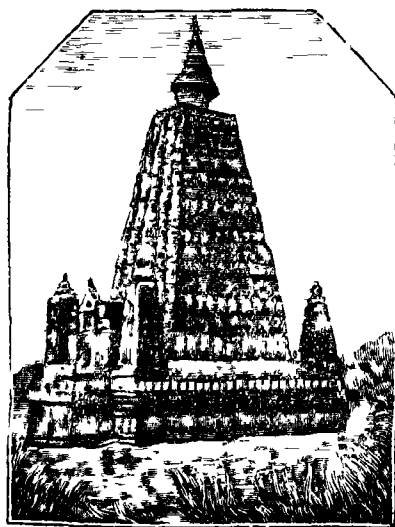
বৌদ্ধস্তূপ।

ভারতের কয়জনে এখন অশোকের নাম জানে! কোথায় গেল অশোকের অগণ্য কীর্ত্তি! কোথায় গেল বৌদ্ধবিহার সকল, কোথায় বা ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম! যে ধর্ম্ম হাজার বৎসর ধরিয়া এদেশে আধিপত্য করিল, আজ তাহা ভারতের কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারত হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত, তাঁহার সকল কীর্ত্তিকলাপ একেবারে লুপ্ত। ইতিহাসে ইহা এক আশ্চর্য্য কথা।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতি ও লয়—বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যত কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, সকলই মুখে মুখে; লিখিত কোন শাস্ত্র ছিল না। বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই তাঁহার পাঁচ শত শিষ্য রাজগৃহের সপ্তপার্ণব গুহায় মিলিত হন। সেই সভায় তাঁহার উপদেশ সকল আবৃত্তি করা হয়। তাহার একশত বৎসরের ভিতর বৌদ্ধভিক্ষুদিগের ভিতর মতভেদ হওয়াতে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় সভা হয়। মহারাজ অশোকের সময়ে তাঁহার রাজধানীতে তৃতীয় সভা হয়। তাহাতে এক সহস্র বৌদ্ধভিক্ষু একত্র হইয়া, বৌদ্ধশাস্ত্র লিপিবদ্ধ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রকে ত্রিপিটক বলে। অশোকের সময় ত্রিপিটক যে আকারে লেখা হয়, আজও তাহা সেই আকারেই আছে। বৌদ্ধদিগের ভিতর আবার দুইটী দল আছে। উত্তরদেশীয় এবং দক্ষিণদেশীয়। তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদিগকে উত্তরদেশীয়, এবং ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধদিগকে দক্ষিণদেশীয় বৌদ্ধ বলে। দক্ষিণের বৌদ্ধেরা অশোকের ত্রিপিটক মতে চলে; আর উত্তরের বৌদ্ধেরা খ্রীষ্টের একশত বৎসরের মধ্যে কাশ্মীরের রাজা কণিষ্কের সময় চতুর্থ সভায় ত্রিপিটকের যে ব্যাখ্যা হয়, তাহারই অনুসরণ করে। ইহারা অশোকের সভার কথা জানে না; অশোকের পূর্ব্বেই এই দুই দল পরস্পর হইতে পৃথক হইয়া পড়ে। এবার বৌদ্ধধর্ম্ম দেশদেশান্তরে প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু মাতৃভূমি ভারতবর্ষ হইতে মুসলমানদিগের

আগমনের পূর্ব্বেই ইহা এক প্রকার বিলুপ্ত হয়। অশোকের রাজত্ব সময় ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবের চরমসীমা বলিলেও হয়। তাহার পরও অনেক যুগ ধরিয়া এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের খুব আদর ছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম কোন দিনই হিন্দুধর্ম্মকে সম্পূর্ণ পরাভব করিতে পারে নাই। দুই ধর্ম্মের প্রভাব সমান ভাবে ছিল। হিন্দু রাজারা বৌদ্ধদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং সাহায্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। আবার বৌদ্ধ রাজারাও ব্রাহ্মণপণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন পরস্পরের ভিতর একটা বিদ্বেষের ভাব ছিল না। ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীন ভ্রমণকারী ফিয়ান্ যখন এদেশে আসেন, তখন দুই ধর্ম্মেরই সমান আদর দেখেন; কিন্তু ৬২৯ খৃঃ অব্দে হোয়েনসাং আসিয়া দেখেন, হিন্দুধর্ম্ম জাগিয়া উঠিতেছে, আর বৌদ্ধধর্ম্ম ম্লান হইয়া আসিতেছে *। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় হিন্দুধর্ম্ম আবার নূতন তেজে জাগিয়া উঠিল। তাহার পর কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ নাস্তিক বৌদ্ধধর্ম্মকে ভয়ঙ্কররূপে আক্রমণ করিলেন। রাজপুত বীরগণও ভীম গর্জ্জনে বৌদ্ধগণকে আক্রমণ করিলেন; এবং তাঁহাদের হস্তে বৌদ্ধ ধর্ম্মের যেটুকু লাঞ্ছনা বাকি ছিল, মুসলমানেরা সেটুকু সাধিল। বৌদ্ধ বিহার ভাঙ্গিয়া হিন্দুরা মন্দির করিলেন; যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান তীর্থ ছিল, তৎ তৎ স্থলেই বৌদ্ধধর্ম্মকে পরাজয় করিয়া হিন্দুতীর্থ স্থাপিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের বাহিরের চিহ্ন সকল এই প্রকারে লয় পাইল বটে, কিন্তু একভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম লয় পাইল না, তাহার অনেক ভাব হিন্দুধর্ম্মের অস্থিমজ্জাগত হইয়া রহিল। হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে

* কিন্তু তখন তিনি গয়ার সন্নিকটে নলন্দা নামক স্থানে বৌদ্ধ-বিহার, বৌদ্ধ পাঠশালা ও বৌদ্ধমঠ দেখিয়াছিলেন। ঐ পাঠশালাতে সহস্র সহস্র ছাত্র বাস করিত; হোয়েনসাং কিছুদিন সেখানে বাস করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা করিয়াছিলেন।

এদেশ হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিল, না বলিয়া, হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিল বলাই ভাল।

জৈনধর্ম্ম বলিয়া আজকাল এদেশে যে ধর্ম্মের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, বৌদ্ধধর্ম্মের সহিত তাহার অনেক সাদৃশ্য আছে, বিশেষতঃ জৈনেরাও বৌদ্ধদিগের ন্যায় অহিংসা পরম ধর্ম্ম, এই কথা প্রচার করে। এমন কি জীবহত্যার ভয়ে জৈনেরা অন্ধকারে আহার করে এবং পাছে নাক মুখ দিয়া কোন প্রাণী উদরে প্রবেশ করে এই ভয়ে মুখে কাপড় জড়াইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, জৈনধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাবীর বুদ্ধের সময়ের লোক ছিলেন

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান।

রাজা বিক্রমাদিত্য—ভারতের ইতিহাসে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নাম চিরস্মরণীয় এবং আজ পর্য্যন্ত হিন্দুরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে তাঁহার নাম স্মরণ করেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে হূন, শক প্রভৃতি অনেক অনার্য্য জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া এদেশে বাস করিতে আরম্ভ করে। বিক্রমাদিত্য তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এদেশ হইতে তাড়াইয়া দেন*। তিনি হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক মহাবীর এবং পণ্ডিতদিগের উৎসাহদাতা ছিলেন। তাঁহার সভায় সর্ব্বদা বিদ্যার চর্চ্চা হইত। সে সময়ের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিয়া থাকিতেন। মহাকবি কালিদাসের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে; তিনি বিক্রমাদিত্যের সভার নয়টী রত্নের মধ্যে একটী রত্ন ছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সময়ে অনেক সুন্দর সুন্দর বই রচিত হইয়াছিল। অশোক রাজার যেমন প্রতাপ ছিল, বিক্রমাদিত্যেরও প্রায় সেইরূপ; তবে তিনি বৌদ্ধ আর ইনি হিন্দু।

বিক্রমাদিত্যের পরে শীলাদিত্য নামে আর একজন শক্তিশালী

---

* বিক্রমাদিত্যের অপর নাম যশোধর্ম্ম দেব। তিনি ৫৩৩ খ্রীঃ অঃ কোরারের যুদ্ধে হূনদিগকে পরাস্ত করেন। প্রাচীন প্রবাদ মতে বিক্রমাদিত্য ৫৬০ খ্রীঃ পূঃ অব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। প্রবন্ধ কোষের রচয়িতা জৈন গ্রন্থকারের মতে কালিদাস মহাবীর স্বামীর মৃত্যুর ৪৭০ বৎসর বর্ত্তমান ছিলেন। কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যের কাল লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে।

রাজা কান্যকুব্জে রাজত্ব করেন। তিনিও সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তকে একছত্র করিয়াছিলেন। অশোকের সময়ে মালব রাজ্যের পরাক্রম কিরূপ ছিল তাহার বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় উজ্জয়িনীই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রধান রাজ্য ছিল। তখন মালব রাজ্য ছারখার হইয়া গিয়াছিল। তারপর কান্যকুব্জ, কাশ্মীর ও গুজ্জর রাজ্যের কথা শুনিতে পাই।

বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে ভারতে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় বলা হইয়াছে। বাস্তবিক তাহাই সত্য। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মকে কোন দিন পরাজয় করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি হইলে হিন্দুধর্ম্ম আবার নূতন তেজে জ্বলিয়া উঠিল। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার হইবার পূর্ব্বে বৈদিক হিন্দুধর্ম্মই এদেশে প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারের পরে বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্ম এদেশে প্রচলিত হইয়াছে। পৌরাণিকধর্ম্ম বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের রূপান্তর। ব্রহ্মা—স্রষ্টা, বিষ্ণু—পালক, মহেশ্বর—সংহার-কর্ত্তা পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মের তিন উপাস্য দেবতা, এক পরমেশ্বরই তিন রূপ।

বিষ্ণুর স্ত্রী লক্ষ্মী এবং মহেশ্বরের স্ত্রী শক্তি বা কালী ও দুর্গা বর্ত্তমান সময়ের প্রধান আরাধ্যা দেবী। যাহারা প্রধানভাবে বিষ্ণুর উপাসক তাঁহাদিগকে বৈষ্ণব, যাহারা শক্তি বা কালী দুর্গার উপাসক তাঁহাদিগকে শাক্ত এবং যাঁহারা মহেশ্বর বা মহাদেবের উপাসক তাহাদিগকে শৈব বলে। রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতিকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া হিন্দুরা পূজা করেন। ইহা ভিন্ন পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের আরও অনেক দেব দেবী আছেন।

দাক্ষিণাত্য—বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণে ভারতবর্ষের যে অংশ, তাহাকে দাক্ষিণাত্য বা দক্ষিণাপথ বলে। দক্ষিণাপথেও অসভ্যজাতিরা বাস করিত। রামায়ণে প্রথমে দাক্ষিণাত্যের কথা শুনিতে পাই, তখন

ইহাকে দণ্ডকারণ্য বলিত। রামায়ণে যে বানর ও রাক্ষসের কথা শুনি, তাহারাই বোধ হয়, দাক্ষিণাত্য ও সিংহলের অসভ্যজাতি এবং বোধহয়, সেই সময় হইতেই দাক্ষিণাত্য হিন্দুদিগের পরিচিত হয়।

অতি প্রাচীন সময়ে আমরা ভারতবর্ষের অতি দক্ষিণে পাণ্ড্য চল ও চের রাজ্যের কথা শুনিতে পাই, তাহাতে বোধ হয়, অতি দক্ষিণে হিন্দুরা প্রথমে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এখন যেখানে মাদুরা ও ত্রিনেল্লুবলি জেলা দেখা যায় আগে সেখানেই পাণ্ড্য রাজ্য ছিল পাণ্ড্য রাজ্যের রাজধানী মাদুরা এখনও আছে। এখন যে সকল দেশে তামিলভাষা প্রচলিত আছে সেই সকল দেশে চল রাজ্য ছিল। চল রাজ্যের রাজধানী কাঞ্চী, এখন কাঞ্চীবরম হইয়াছে। ইহ কাঞ্চীপুরম এই শব্দের অপভ্রংশ মাত্র বিক্রমাদিত্যের সময়ে এ সকল রাজ্যও খুব প্রতাপশালী ছিল

চেররাজ্য—পাণ্ড্যরাজ্যের পশ্চিমে ও আরবসাগরের উপকূলে চের রাজ্য ছিল, এখন সেখানে কোয়েমবাটুর, ত্রিবাঙ্কুর ও মালাবার দেশ

উত্তরে নর্ম্মদা নদী ও দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী, ইহার মধ্যে দুইটী রাজ্য ছিল; একটী পূর্ব্বে তাহার রাজধানীর নাম ওয়ারঙ্গল, আর একটি পশ্চিমে ছিল, যাহাকে এখন আমরা মহারাষ্ট্র ও কঙ্কন দেশ বলি। নর্ম্মদা নদীর তীর হইতে কৃষ্ণা নদীর তীর পর্য্যন্ত অন্ধ্রবংশীয় রাজগণ আর একটী রাজ্য স্থাপন করেন, এক সময়ে সে রাজ্যের ক্ষমতা এত অধিক হইয়াছিল যে, তাহার সমকক্ষ রাজ্য তখন ভারতবর্ষে আর ছিল না।

উড়িষ্যা—উড়িষ্যাদেশেও অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ প্রবেশ করিয়াছিলেন; এবং প্রায় সেদিন পর্য্যন্ত (১৫৫০ খৃষ্টাব্দে) হিন্দু-রাজারা উড়িষ্যাতে রাজত্ব করিতেছিলেন। এখন যে ভুবনেশ্বরের সুন্দর মন্দির দেখা যায়, তাহা কেশরীবংশের রাজারা নির্ম্মাণ করিয়া-

ভূবনেশ্বরের মন্দির।
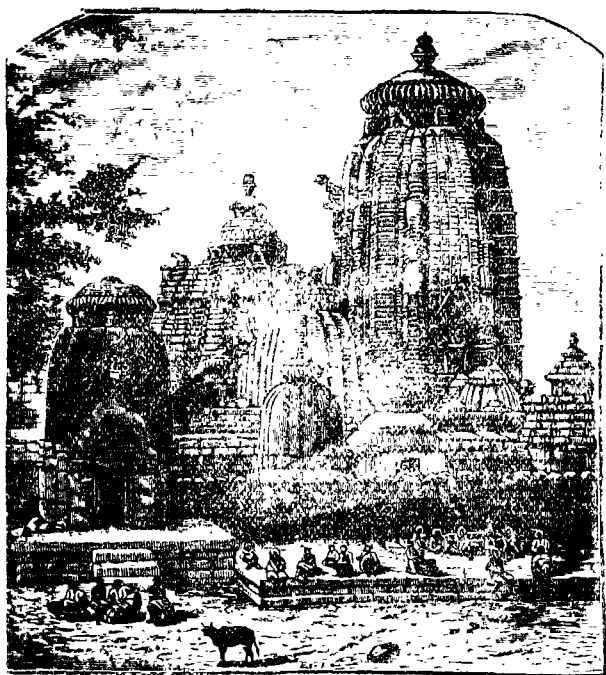
ছিলেন, এবং তাহার অনেক পরে গঙ্গবংশীয় রাজাদিগের সময়ে উড়িষ্যার বিখ্যাত জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মিত; এই মন্দির এখন হিন্দুদিগের একটী প্রধান তীর্থ স্থান। দাক্ষিণাত্যেও অনেক বড় বড় রাজ্য ছিল, তাহাদের এক এক রাজা এক এক সময়ে প্রধান হইয়া, অন্য রাজ্য সকলকে অধীন করিয়া লইত। এইরূপে ভারতবর্ষে কত শত রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

হিন্দুদিগের সভ্যতা ও পাণ্ডিত্য—হিন্দুদিগের বিশ্বাসযোগ্য কোন ইতিহাস নাই বটে, কিন্তু ইঁহারা সেই ঋগেদের সময় হইতে যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে ইতিহাসের কথা অনেক জানিতে পারা যায়। হিন্দুদিগের ন্যায় পুরাতন সুসভ্য জাতি পৃথিবীতে আর নাই। গ্রীক, রোমীয় প্রভৃতি জাতীয়েরা পুরাকালে সভ্য জাতি বলিয়া খ্যাত; হিন্দুরা তাঁহাদের অপেক্ষাও পুরাতন জাতি। এমন একদিন ছিল, যখন জগতের লোক শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের সহিত ভারতের দিকে চাহিয়া থাকিত জগতে কিছুই চিরদিন একভাবে থাকে না। হিন্দুরা দর্শনশাস্ত্র এমন জানিতেন যে, এখন ইউরোপীয়েরা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতেছেন; জ্যোতির্বিদ্যাও হিন্দুরা বেশ জানিতেন, আর অঙ্ক ও বীজগণিতে হিন্দুরা অদ্বিতীয় ছিলেন। এখন আমরা যে দশমিক নিয়মে অঙ্ক কসি, হিন্দুরা শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাহা আবিষ্কার করেন। এখন সেই নিয়মেই সভ্য-জগতের লোক অঙ্ক কসিতেছে। ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি সবই এদেশে ছিল। হিন্দুরা এই সকল বিদ্যা অন্য জাতির নিকট শিখেন নাই; জগতের লোক তাঁহাদিগের নিকট শিখিয়াছে হিন্দুদিগের ভাষা ও ব্যাকরণের মত ব্যাকরণ আর কোন জাতির নাই। এমন ভাষায় যাহারা মনের ভাব ব্যক্ত করিতেন, তাঁহাদিগকে শতবার প্রণাম করিতে হয়। কি প্রতিভা! কি পাণ্ডিত্য! সুন্দর অট্টালিকায় বাস ও সুন্দর পোষাক পরিলেই সুসভ্য জাতি হয় না; যাহাদের মনের ভাব উচ্চ, যাহাদের ধর্ম্মভাব সুন্দর, তাঁহারাই সুসভ্য। হিন্দুজাতির আর এক গৌরবের বিষয় এই,—হিন্দুরা বড়ই ধর্ম্ম-প্রিয়; জীবনটাকে তাঁহারা আমোদ আহ্লাদ করিয়া কাটাইবার জিনিস ভাবিতেন না, ধর্ম্মলাভ করিবার জন্যই এই

জীবন; পৃথিবীতে দুদিনের বাস, ইহা তাঁহারা সর্ব্বদা মনে করিতেন। তাঁহারা পৃথিবীর সকলই মিথ্যা ও মায়া ভাবিতেন। দেখ, হিন্দুরা যে রেলগাড়ি করেন নাই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ করেন নাই, টেলিগ্রাফ করেন নাই, তাহার কারণ ইহা নহে যে, তাঁহাদের বুদ্ধি ছিল না; কিন্তু পৃথিবীর সুখ সুবিধাকে তুচ্ছ ভাবিতেন বলিয়াই, তাঁহারা এ সকল বিষয়ে মন দেন নাই। আরও একটা কারণ আছে, ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মকর্ম্ম ও পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন; এ সকলের ভার নিম্ন-বর্ণের উপর ছিল, তাহাদের বুদ্ধিশক্তি বাড়ে নাই, প্রতিভাও ছিল না; সেই জন্য এত যুগ ধরিয়া এই সকল বিদ্যা ভারতে একই ভাবে রহিয়াছে। সভ্যতার প্রধান লক্ষণ যেগুলি সেই অনুসারে হিন্দুরা অতি সভ্য।

মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে আসিবার প্রাক্কালে রাজপুতজাতির উত্থান—মুসলমানগণ যখন এদেশে প্রথম আসিলেন, তখন তাহারা আর্য্যাবর্ত্তে রাজপুতানা অঞ্চলে রাজপুত নামে একজাতি দেখেন। ইহারাও হিন্দু, এবং ইহাদিগের তুল্য বীর জগতে ছিল না। অনেকে অনুমান করেন, ইহারা আর্য্য-সন্তান নহেন; ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে শক প্রভৃতি যে সকল বিজাতীয়েরা আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, ইহারা বোধ হয় সেই শক জাতি। ৭৫০ হইতে ১০০০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে রাজপুতেরা আর্য্যাবর্ত্তের সকল পুরাতন রাজ্যকে পরাস্ত করিয়া, সর্ব্বে সর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে হিন্দুরাজা বৌদ্ধদিগকে খুব সম্মান ও সাহায্য করিতেন। কিন্তু ইহারা বৌদ্ধদিগের ঘোর শত্রু হইয়া তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন ও হত্যা করিয়া, ভারতবর্ষ হইতে এক প্রকার নির্ব্বাসিত করিয়া ফেলিলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের জয় জয়কার ঘোষণা করিলেন।

অনেকে বলেন, এই কারণেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদিগকে সূর্য্যবংশজাত ক্ষত্রিয় বলেন; আদৌ তাঁহারা ক্ষত্রিয় নহেন। জানি না, এ কথায় কতটুকু সত্য আছে। সে যাহাই হউক, মুসলমানেরা যখন এদেশে আসিলেন তখন পঞ্জাবে, দিল্লীতে, আজমীঢ়ে, কান্যকুব্জে, বারাণসীতে সর্ব্বত্রই রাজপুতেরা রাজত্ব করিতেছিলেন। এত বড় বীরজাতি থাকিতে মুসলমানেরা এদেশ কিরূপে জয় করিলেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। যদি রাজপুত জাতি সকলের মধ্যে একতা থাকিত, তাহা হইলে তাহারা এত সহজে কখন পরাজিত হইতেন না। যখন মুসলমানেরা প্রথম এদেশে আসিলেন, তখন পৃথ্বীরায় দিল্লী ও আজমীঢ়ের রাজা ছিলেন। কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের সহিত কোনও কারণে পৃথ্বীরায়ের বিবাদ ছিল। কান্যকুব্জের রাজার কন্যা সংযুক্তার স্বয়ম্বর উপস্থিত হইল। দেশ বিদেশের রাজারা বিবাহের জন্য আসিলেন, পৃথ্বীরায় আসিলেন না। জয়চন্দ্র তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য পৃথ্বীরায়ের এক মূর্ত্তি গড়িয়া, দ্বারদেশে দ্বারবান করিয়া রাখিলেন। স্বয়ম্বর-সভায় সংযুক্তা মালা হাতে করিয়া একে একে সকল রাজাকে ছাড়িয়া পৃথ্বীরায়ের মূর্ত্তির গলায় মালা দিলেন। এরূপ কথিত আছে, পৃথ্বীরায় কাছেই লুকাইয়া ছিলেন, তিনি সংযুক্তাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন। জয়চন্দ্র তাঁহাকে ছাড়িলেন না। দুই রাজায় ঘোর শত্রুতা বাধিয়া গেল। জয়চন্দ্র পৃথ্বীরায়ের সঙ্গে একা না পারিয়া, মুসলমানদিগকে ডাকিলেন, দেশের ও স্বজাতির সর্ব্বনাশ করিলেন। প্রথম যুদ্ধে * পৃথ্বীরায় মুসলমানদিগকে পরাজিত করেন, কিন্তু শেষ যুদ্ধে † স্বয়ং হারিয়া যান ও প্রাণ হারান। মুসল-

* ইহাকে তিরৌরীর যুদ্ধ বলে। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে হয়।

† ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের যুদ্ধ হয়।

মানের দিল্লী ও আজমীঢ় কাড়িয়া লইলেন। তাহার পর বৎসর আসিয়া জয়চন্দ্রকে মারিয়া কাণ্যকুব্জ কাড়িয়া লইলেন। জয়চন্দ্র জব্দ হইলেন, ভারত স্বাধীনতা হারাইল, মুসলমানেরা আসিয়া সকল অধিকার করিল। এই খানেই হিন্দুদিগের স্বাধীনতার সূর্য্য অস্ত গেল।

মুসলমান বিজয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুকুমারমতি পাঠকপাঠিকাগণ, একবার আসিয়ার ম্যাপখানা দেখ দেখি, আমাদের ভারতবর্ষই বা কোথায়, আর আরব দেশই বা কোথায়। আমাদের ভারতবর্ষ যখন স্বাধীনতার গৌরবে সমুজ্জ্বল, তখন আরবদেশের মক্কানগরে কোনও গৃহস্থের গৃহে একটী শিশু জন্মগ্রহণ করিল; তখন কেহ একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই, এই শিশু কালে জগতের ইতিহাসে এক মহা প্রলয় ঘটাইবে। এই শিশুটী কে জান? ইনি মুসলমানধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ।

মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে আরবদেশের নাম জগতের লোকে বড় একটা জানিত না, কারণ আরবদেশ বড় অনুর্ব্বর; চারিদিকে মরুভূমি; আরবদেশ শস্যশালী না হওয়াতে, আরবের লোকেরা কোনও কালে ধনী বা সুসভ্য হইতে পারে নাই। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বে

আরবেরা মুসলমান ছিল না—অর্থাৎ এক ঈশ্বরের পূজা করিতে জানিত না। তাহারা গ্রহ, নক্ষত্র ও দেবদেবীর পূজা করিত। মহম্মদই আরববাসীদিগকে এক ঈশ্বরের পূজা করিতে শিখান। এখন মহম্মদের জীবন সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিব।

৫৭০ খৃঃ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম আবদুল্লা ও মাতার নাম আমেনা। মহম্মদের জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। সে সময়ে ধাত্রী-গৃহে রাখিয়া সন্তান মানুষ করা, মক্কা নগরের লোকের রীতি ছিল। মহম্মদ যখন ৪০ দিনের শিশু, তখন তাঁহাকে একজন ধাত্রীর নিকট দেওয়া হয়। সেই ধাত্রী তাঁহাকে অতি যত্নে মানুষ করেন এবং মহম্মদও তাঁহাকে ঠিক মায়ের মত ভাল বাসিতেন। মহম্মদ যখন ৬ বৎসরের বালক, তখন তাঁহার মাতা আমেনার মৃত্যু হয়। তিনি নাকি মৃত্যুর সময়ে বলিয়াছিলেন "সকলেরই মৃত্যু আছে, আমিও মরিতেছি, কিন্তু যে পুত্র আমি গর্ভে ধরিয়াছি, সেই আমায় অমর করিয়া রাখিবে।" মহম্মদের পিতামহ এই পিতৃমাতৃহীন বালককে অতি যত্নের সহিত পালন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুদিন পরে তাঁহারও মৃত্যু হইল। বৃদ্ধ মৃত্যুর সময় মহম্মদের কথা ভাবিয়া আকুল হইলেন। তিনি বালকের পিতৃব্যকে ডাকিয়া, তাঁহার হস্তে মহম্মদকে সমর্পণ করিলেন, এবং নিজের সন্তানের ন্যায় যত্ন করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য ও পিতার মৃত্যু সময়ের এই অনুরোধ প্রাণপণে পালন করিয়াছিলেন। যখন মহম্মদের ২৫ বৎসর বয়স তখন খোদেজা নাম্নী একজন ধনশালিনী বিধবার কর্ম্মচারী হইয়া বাণিজ্যের জন্য দেশান্তরে যান। খোদেজা মহম্মকে দেখিয়া ও তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া, তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হন। সেই সময়ে খোদেজার মত সম্পত্তিশালিনী রমণী সে দেশে আর কেহ ছিলেন না।

তিনি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনি সাধ্বী ছিলেন। খোদেজার আগ্রহ দেখিয়া, মহম্মদ তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। তখন মহম্মদের বয়স ২৫ বৎসর মাত্র। কিন্তু খোদেজার বয়স ৪০ বৎসর হইয়াছিল। মহম্মদ বাল্যকাল হইতে অতিশয় চিন্তাশীল ছিলেন, সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভাল বাসিতেন। কথিত আছে, বিবাহের পর প্রায় তিনি শুনিতে পাইতেন, কে তাঁহাকে ডাকিতেছে। চারিদিকে চাহিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। ক্রমে তাঁহার প্রাণের শান্তি চলিয়া গেল, এবং কোনও এক অজ্ঞাত পদার্থের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তিনি পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। লোকের সঙ্গ অসহ্য বোধ হইল। মক্কার নিকটে হোরা নামে এক পর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বতের নিজ্জন গুহায় তিনি রাত দিন ঈশ্বর-চিন্তায় কাটাইতেন। মধ্যে মধ্যে আসিয়া পরিবার পরিজনদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এইরূপে বহুদিন ধরিয়া নিজ্জনে ঈশ্বর-চিন্তায় কাটাইয়া ৪০ বৎসর বয়সে, তিনি প্রচার করিলেন যে, এক ঈশ্বর ভিন্ন দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই এবং স্বয়ং মহম্মদ ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ। আরবের লোকের নিকট এই নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। মক্কা নগরের নিকট এক পর্ব্বতে উঠিয়া, মক্কাবাসীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "হে মক্কাবাসিগণ শ্রবণ কর, একমাত্র পরমেশ্বর ব্যতীত জীবের আর উপায় নাই।" মক্কাবাসিগণ এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কেহ বা তাঁহাকে পাগল বলিল, কেহ বা তাঁহার কথা শুনিয়া ক্রোধে আগুন হইল; কিন্তু মহম্মদ নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে থাকিলেন। তাঁহার স্ত্রী খোদেজা তাঁহার প্রথম শিষ্যা হইলেন। ক্রমেই মহম্মদের আরও নূতন শিষ্য জুটিতে লাগিল। তখন মক্কাবাসিগণ তাঁহাকে ভয়ানক উৎপীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এই ঘোর অত্যাচারের সময় মহম্মদের পত্নী খোদেজার মৃত্যু হয়। তাহাতে মহম্মদ শোকে

বড় কাতর হন। কারণ খোদেজা সকল বিষয়ে মহম্মদের সহায় ছিলেন, এবং তিনিও তাঁহাকে অতিশয় সম্মান করিতেন ও অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেন।

যতদিন খোদেজা বাঁচিয়াছিলেন, ততদিন মহম্মদ আর বিবাহ করেন নাই; কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আরও ৪।৫ জনকে বিবাহ করিয়াছিলেন। অনেক বিবাহ করা আরবদেশের রীতি ছিল। খোদেজার মৃত্যুর পর মক্কার লোকেরা মহম্মদের প্রতি এমন ভয়ানক অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল যে, তিনি প্রাণ লইয়া আর সেখানে থাকিতে পারিলেন না। অবশেষে মক্কা ত্যাগ করিয়া, মদিনায় প্রস্থান করিলেন। মহম্মদ আসিতেছেন শুনিয়া, মদিনাবাসীরা দলে দলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইল। সকলেই মহম্মদকে একবার দেখিবার জন্য ও তাঁহার কথা শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইল। মদিনায় এমন দৃশ্য কখনও দেখা যায় নাই। মহম্মদের জীবনে এমন দিন কখন হয় নাই। তিনি মদিনাবাসীদিগের আদর পাইয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিলেন। মহম্মদের মদিনা পলায়নের দিন হইতে হিজরী অর্থাৎ মুসলমানী সাল গণনা করা হয় (৬২২ খৃঃ অঃ)। মদিনায় তিনি এক মসজিদ নির্ম্মাণ করিলেন। সেখানে সকল মুসলমানেরা মিলিয়া নমাজ পড়িতেন। ক্রমে মুসলমানের সংখ্যা এত বাড়িয়া উঠিল যে, সে মসজিদে আর কুলাইত না। মহম্মদ মদিনায় চলিয়া আসিলেন বটে, কিন্তু মক্কায় যে সকল মুসলমান ছিল, তাহাদের প্রতি ঘোর অত্যাচার চলিতে লাগিল। তখন মহম্মদ এত অত্যাচার সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত বিবেচনা করিলেন না। অত্যাচারীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে হইবে, এই স্থির করিয়া সৈন্যদল প্রস্তুত করিলেন। মুসলমানদিগকে তখন হইতে মহম্মদ শান্তভাব ত্যাগ করিয়া অস্ত্রধারণ করিয়া, শত্রুদমনের জন্য প্রস্তুত করিলেন। তিনি বলিলেন, ঈশ্বর আমাকে

বলিয়াছেন, "তুমি শত্রু নিপাত কর, আমি তোমার সহায়।" তখন হইতে মুসলমানেরা কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মক্কায় গিয়া মক্কা জয় করিলেন। মুসলমানদিগের বিজয় হুঙ্কারে আরবের দিগ্দিগন্ত কাঁপিতে লাগিল। চারিদিকে মুসলমানধর্ম্মের পতাকা উড়িতে লাগিল। ৬৩২ খৃঃ অব্দে মহম্মদের মৃত্যু হয়।

মহম্মদ আরববাসীদিগকে অনেক ভাল কথা, অনেক নূতন কথা শিখাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। মহম্মদের ধর্ম্ম আরববাসীদের প্রাণে ও শরীরে যেন নূতন বল আনিয়া দিল। মহম্মদ ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া ধর্ম্ম প্রচারের জন্য মুসলমানদিগের হস্তে যে তরবারি দিলেন তাহার দুর্জ্জয় শক্তি রোধ করে সাধ্য কার? ধর্ম্মের নামে মানুষের হৃদয়ে কত না বল আসে। সেই ধর্ম্মের নামে মুসলমানেরা যখন তরবারি ধরিল, তখন বলিতে গেলে সমুদায় পৃথিবী সে তরবারিকে বাধা দিতে পারিল না। মহম্মদের মৃত্যুর একশত বৎসর অতীত হইতে না হইতে, আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে সিন্ধু নদ পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত দেশ মুসলমানদিগের অধীন হইল।

মুসলমানদিগের ভারতবর্ষে প্রবেশ।

মহাল্যিব—মহম্মদের মৃত্যুর ৩২ বৎসর পরে মহাল্যিব নামে একজন মুসলমান সেনাপতি সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। তিনি মুলতান পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন এবং অনেক লোককে বন্দী করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন। পরে বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা আর ভারতবর্ষের দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন নাই।

মহম্মদ বিন কাসিম—(অর্থাৎ কাসিমের পুত্র মহম্মদ) এই ঘটনার প্রায় ৪৭ বৎসর পরে, (৭১২ খৃঃ অঃ) মহম্মদ বিন কাসিম নামে একজন মুসলমান সেনাপতি সিন্ধুনদের মুখে দেবল নামে যে প্রসিদ্ধ

বন্দর ছিল, তাহা আক্রমণ করেন। সেই বন্দরের হিন্দু জলদস্যুগণ আরবদের একখানি বাণিজ্যের জাহাজ ধরিয়াছিল, তাই মহম্মদ হিন্দুদিগকে জব্দ করিবার জন্য আসেন। সেই সময়ে দাহির নামে একজন রাজপুত রাজা মুলতান ও সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। আলোর তাঁহার রাজধানী ছিল। মুসলমানেরা তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করিল। রাজা দাহির অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া, মহম্মদের গতি রোধ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। মহম্মদ তাঁহার সৈন্যবল দেখিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইলেন এবং আর অগ্রসর না হইয়া, একটি ভাল স্থান দেখিয়া, তথায় আপন সৈন্যদিগকে রাখিলেন। দাহির অমিতবলে মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার জয়ী হইবার সকল সম্ভাবনাই ছিল, কিন্তু দৈব তাঁহার প্রতি বাম হইলেন; যুদ্ধের মধ্য-ভাগে একটী জ্বলন্ত গোলা আসিয়া, দাহিরের হস্তীকে বিদ্ধ করিল, হস্তী আহত হইয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া, নিকটস্থ এক নদীতে নামিল। সৈন্যগণ হঠাৎ রাজাকে পলাইতে দেখিয়া রণে ভঙ্গ দিল। রাজা ঘোড়ায় চড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া, ছত্রভঙ্গ সৈন্যদিগকে ফিরাইতে কতই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ইতি-পূর্ব্বেই তিনি বাণাহত হইয়াছিলেন, তথাপি কিছুই গ্রাহ্য না করিয়া, অসীম সাহসের সহিত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে, সম্মুখসমরে বীরের মত প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার রাজ্য মহম্মদের হস্তগত হইল। মহম্মদ প্রায় তিন বৎসর সিন্ধুদেশ এবং পঞ্জাব শাসন করেন। যদিও তিনি নিতান্ত অল্পবয়স্ক ছিলেন, তথাপি হিন্দু প্রজাগণ তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয় হইতে না হইতেই অস্ত গেল। পারস্যরাজের আজ্ঞায় তিনি বন্দী হইয়া, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মহম্মদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদিগের ভারতবর্ষ-

বিজয় স্থগিত হইল। ৪০ বৎসরের মধ্যে মুসলমানদিগের অধিকৃত সমস্ত স্থান হিন্দুদিগের হস্তগত হইল। ইহার পরে ২০০ বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা আর ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হয়েন নাই। ভারতবর্ষ পূর্ণমাত্রায় স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিতে লাগিল।

মুসলমানদিগের অধিপতি মহম্মদের উত্তরাধিকারীকে খলিফা বলিত; সকল সেনাপতি ও সকল শাসনকর্ত্তাই খলিফার অধীন ছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে খোরাসান দেশে আলপ্ত-গিন নামে তুর্কী জাতীয় একজন শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তিনি পূর্ব্বে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রভুর মৃত্যু হইলে, তিনি দল বল লইয়া গজনীতে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করেন। ৯৭৭ খৃঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যুহইলে,তাঁহার ক্রীতদাস এবং জামাতা সবুক্তগীন রাজাহইলেন।

যে সময়ে সবুক্তগীন গজনীর রাজা হইলেন, সে সময়ে লাহোরে হিন্দুরাজা জয়পাল রাজত্ব করিতেছিলেন। ভারতবর্ষের এত নিকটে এই নূতন মুসলমান রাজ্য দেখিয়া, জয়পালের অত্যন্ত আতঙ্ক হইল। তাঁহার প্রাণের শান্তি ভঙ্গ হইল এবং তিনি অকারণ বিস্তর সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু যুদ্ধের পূর্ব্বে ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে হিন্দুরা ভাবিলেন, দৈব তাঁহাদের প্রতিকূল কাজেই যুদ্ধে তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন। জয়পাল সবুক্তগীনকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া ৬০টী হাতী ও অনেক অর্থ দিবার অঙ্গীকার করিয়া, দেশে ফিরিলেন। স্বরাজ্যে আসিয়া জয়পাল সকল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলেন এবং সবুক্তগীন যে দূত পাঠাইলেন, তাহাকে বন্দী করিলেন। এই অপ-মান ও বিশ্বাসঘাতকতা সবুক্তগীন কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি জয়পালের শাসনের জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন। জয়পাল নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি অন্যান্য হিন্দুরাজাদিগের সাহায্যে প্রায় এক লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিলেন, কিন্তু যুদ্ধেজয়লাভ করিতে পারিলেন না।

সিন্ধুনদ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়া সবুক্তগীন দেশে ফিরিলেন। তোমাদের হয় ত মনে আছে, জয়চন্দ্র সাহাবুদ্দিনকে ডাকিয়া দেশের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। এখন জয়পালও গায়ে পড়িয়া অকারণ সবুক্তগীনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গিয়া, দেশের সর্ব্বনাশ করিলেন। কিছুদিন পরে সবুক্তগীনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার পুত্র মহমুদ গজনীর রাজা হইলেন

মহমুদ—সুলতান মহমুদ একজন খুব বড় রাজা ছিলেন। সেই সময়ে সমস্ত আসিয়ায় তাঁহার মত প্রাতাপান্বিত রাজা আর কেহই ছিলেন না। মহমুদ সতেরবার ভারতবর্ষে আসেন; তিনি এই সময় মধ্যে নগর কোট, মথুরা থানেশ্বর, সোমনাথ প্রভৃতি হিন্দুদিগের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থানের দেব-মন্দিব সকল চূর্ণ করিয়া, অনেক ধনরত্ন লইয়া এবং বিস্তর বন্দী সঙ্গে করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। মহমুদ রাজা হইবার কয়েক বৎসর পরেই, লাহোরেব রাজা জয়পালকে শাস্তি দিবার জন্য ভারতবর্ষে আসেন; এবং যুদ্ধে তাঁহাকে হারাইয়া, বন্দী করিয়া লইয়া যান। জয়পাল পরে অনেক অর্থ দিয়া কারামুক্ত হন বটে, কিন্তু বার বার মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে হারিয়া ও তাঁহাদিগের হস্তে বন্দী হইয়া, তাঁহার প্রাণে দারুণ ঘৃণাব উদয় হয়। তাই তিনি পুত্রকে রাজ্য দিয়া অগ্নিকুণ্ডে দেহ ভস্মসাৎ করেন। তাঁহার পুত্র অনঙ্গ পালও মহমুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারেন নাই। দেশ জয় করা মহমুদের উদ্দেশ্য ছিল না; কেবল হিন্দুধর্ম্মের অবমাননা ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শেষবার আসিয়া সোমনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির চূর্ণ করেন (১০২৪ খৃঃ অঃ)। এইবারে তাঁহাকে অনেক কষ্টে মরুভূমি পার হইয়া আসিতে হইয়াছিল। পথে আসিতে আসিতে, দুই জন বড় হিন্দু রাজার রাজধানী আক্রমণ করিয়া বিস্তর ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন। অবশেষে

তিনি সোমনাথের মন্দিরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুজরাটের দক্ষিণে সোমনাথের বিখ্যাত মন্দির ছিল। দেশের যত রাজা ও ধনী লোকেরা এই মন্দিরে রাশি রাশি ধন দান করিতেন। ইহার ২০০০ পুরোহিত ছিল এবং ২০০০ গ্রামের আয়ে ইহার খরচ চলিত। সোমনাথের ধন ঐশ্বর্য্যের জাঁক জমকের সীমা পরিসীমা ছিল না; তাই এই মন্দিরের ধনরত্নের প্রতি মহমুদের এত লোভ পড়িয়া ছিল; এবং সেই জন্যই অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়া মরুভূমি পার হইয়া তিনি আসিয়াছিলেন। মহমুদকে সসৈন্যে উপস্থিত দেখিয়া, মন্দির হইতে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার সন্মুখে আসিয়া বলিল,—"তোমরা ফিরিয়া যাও, যদি আক্রমণ কর স্বয়ং সোমনাথ তোমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবেন।" মহমুদ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; মন্দির আক্রমণ করিলেন। তখন হিন্দুরা সোমনাথের সম্মুখে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "ঠাকুর! আজ তোমার নামের গৌরব রক্ষা কর। ম্লেচ্ছেরা যেন এই পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ না করে।" তখন মন্দিরের বাহিরে মুসলমান-দিগের গগনবিদারী "আল্লা হো আকবর অর্থাৎ মহান্ ঈশ্বর" এই রবে পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিল। রাজপুত বীরগণ দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া, অসীম উৎসাহের সহিত মন্দির রক্ষা করিবার জন্য ছুটিয়া গেলেন; মুসলমানগণ মন্দিরের প্রাচীরে উঠিতে আরম্ভ করিলেন; রাজপুতেরা তাহাদিগকে কোনপ্রকারেই উঠিতে দিলেন না। তার পর-দিনও মুসলমানেরা উঠিতে চেষ্টা করিলেন; রাজপুত বীরদিগের নিকট এক পাও অগ্রসর হইতে পারিলেন না; এবং বিস্তর মুসলমান হত হইল। তৃতীয় দিন হিন্দুরাজারা সৈন্য সামন্ত লইয়া, মন্দির রক্ষার জন্য উপস্থিত হইলেন; তখন মুসলমানদিগের মন দমিয়া গেল; কিন্তু মহমুদ কিছুতেই ভীত বা নিরাশ হইলেন না। তিনি ঘোড়া হইতে নামিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিলেন; তার পর "ভয় নাই, ভয় নাই, ঈশ্বর আমাদের সহায়"

বলিয়া মহাতেজে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। তাহারাও "আল্লা হো আক্‌বর" রবে গগন কাঁপাইয়া মহাতেজে মন্দিরের দিকে ছুটিল। তখন তাহাদের গতি রোধ করে কার সাধ্য? ঘোর যুদ্ধ বাধিল কথিত আছে সে দিন ৫০০০ হাজার হিন্দু রণক্ষেত্রে পড়িল। অবশেষে মন্দির রক্ষা করা অসম্ভব দেখিয়া, হিন্দু সৈন্যগণ নৌকায় চড়িয়া সমুদ্রের দিকে পলায়ন করিল। মহমুদ অবাধে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন; এবং মন্দিরের ভিতরের সৌন্দর্য্য, গাম্ভীর্য্য ও কারুকার্য্য দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। তারপর মূর্ত্তি ভাঙ্গিবার জন্য তরবারি তুলিলেন। ব্রাহ্মণেরা আসিয়া চরণ ধরিয়া বলিলেন যে, যদি তিনি মূর্ত্তিটী না ভাঙ্গেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহাঁকে বিস্তর অর্থ দিবেন। মহমুদ শুনিলেন না, তিনি আঘাত করিলেন। কথিত আছে, অমনি রাশি রাশি মাণিক্য মূর্ত্তির ভিতর হইতে বাহির হইল।* তাহার পর মন্দির চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া, বহু মণি রত্ন লইয়া মহা উল্লাসে মহমুদ দেশে ফিরিলেন। মুসলমানেরা মহমুদের বড় প্রশংসা করেন, তাঁহার প্রশংসার যোগ্য অনেক গুন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বীর, কষ্টসহিষ্ণু, ন্যায়পরায়ণ রাজা ছিলেন এবং মুসলমানধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ভারতবাসীর তাহাতে কি? ভারতের ধন রত্ন লুণ্ঠন করিয়া, তাঁহার লোভ অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। তিনি ভারতবর্ষের সুন্দর সুন্দর নগর সকলকে শ্রীহীন শ্মশান সমান করিয়া তাঁহার নিজের রাজধানী গজনীকে সেই সকল মণিমাণিক্য দিয়া অমরাপুরীর মত সাজাইয়াছিলেন।

মহমুদের সময় হইতেই পঞ্জাব মুসলমানদিগের অধীন হইল।

---

* সোমনাথের মূর্ত্তিটী শূন্যগর্ভ ছিল না। সেটী শিবলিঙ্গ ছিল। সুতরাং ঐতিহাসিকেরা এ ঘটনাটি মিথ্যা বলিয়া মনে করেন।

মহমুদের পরে ১৫০ বৎসরের মধ্যে মুসলমানেরা আর এদেশে আসেন নাই। এই সময়ের মধ্যেই মহমুদের এত সাধের গজনী সহর ধ্বংস হইল। এইবারে যিনি ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহার নাম সাহাবউদ্দীন বা মহম্মদ ঘোরী। ইনি ঘোরনগরের রাজা গিয়াস-উদ্দীনের ভাই। ইহাঁরাই গজনীনগর ধ্বংস করেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং হয়ত তাহা তোমাদের মনে আছে জয়চন্দ্র কি করিয়া সাহাবউদ্দীনকে ডাকিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন। ইনিই সেই সাহাবউদ্দীন। তিরৌরীর যুদ্ধে ইনি পৃথ্বীরায়ের নিকট হারিয়া যান; তাহার পর আসিয়া, পৃথ্বীরায়কে থানেশ্বরের যুদ্ধে পরাস্ত ও হত করেন; জয়চন্দ্রকে মারিয়া কান্যকুব্জ কাড়িয়া লয়েন। শেষে কুতবুদ্দীন নামক এক শক্তিশালী ক্রীতদাসের উপর ভারতবিজয়ের ভার দিয়া, তিনি দেশে ফিরিয়া যান। ভারতের ইতিহাসে কুতবুদ্দীন খুব প্রসিদ্ধ। সাহাবউদ্দীনের মৃত্যুর পর ইনিই সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষের স্বাধীন মুসলমান রাজা হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাঠান রাজত্ব।

(১২০৬ –১৫২৬)

দাসবংশ	১২০৬ হইতে	১২৮৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।			
খিলজীবংশ	১২৮৮	„	১৩২১	„	„
তগলকবংশ	১৩২১	„	১৪১৪	„	„
সৈয়দবংশ	১৪১৪	„	১৪৫০	„	„
লোদীবংশ	১৪৫০	„	১৫২৬	„	„

দাসবংশ।

১।	কুতব	১২০৬—১২১০
২।	আরাম	১২১০—১২১১
৩।	আলতামস	১২১১—১২৩৬
৪।	রোকনউদ্দীন	১২৩৬—
৫।	রজিয়া	১২৩৬—১২৩৯
৬।	বাহরাম	১২৩৯—১২৪১
৭।	মসউদ	১২৪১—১২৪৬
৮।	নসিরউদ্দীন	১২৪৬—১২৬৬
৯।	গেয়াসউদ্দীন বলবন	১২৬৬—১২৮৬
১০।	কায়কোবাদ	১২৮৬—১২৮৮

কুতব যে বংশের আদি পুরুষ সে বংশকে দাসবংশ বলে; কারণ তিনিও তাঁহার বংশের অনেকে ক্রীতদাস ছিলেন। এই বংশে দশজন

রাজা হন। তাহার মধ্যে অনেকে নাম মাত্র রাজা। তাঁহারা যেমন অপদার্থ, তেমনই শক্তিহীন ছিলেন। কুতব মোটে ৪ বৎসর রাজত্ব করেন এবং সেই কয় বৎসর বেশ সুশাসন করিয়াছিলেন। তৃতীয় রাজা আলতামস বেশ বুদ্ধিমান ও ক্ষমতাপন্ন রাজা ছিলেন। আলতামস ক্রীতদাস ছিলেন, তৎপরে রাজার জামতা হন। আলতা-মসের রাজত্বকালে চেঙ্গিস খাঁ নামে একজন মোগল বীর ঘোর দাবানলের মত আসিয়ার এক প্রান্ত হইতে আর প্রান্ত এবং ইউরোপের কোন কোন অংশ গ্রাস করেন। যেখান দিয়া চেঙ্গিস খাঁ গিয়াছেন, সেই খানেই রক্ত-স্রোত, হাহাকার ও অগ্নিকাণ্ডে পৃথিবী শ্মশান হইয়াছে। মানবজাতির এমন শত্রু পৃথিবীকে অতি অল্পই জন্মিয়াছে। সৌভাগ্য এই ভারতের দিকে ইহাঁর দৃষ্টি পড়ে নাই। তাড়িত রাজারা আলতামসের আশ্রয় চাহিয়াছিলেন, চতুর আলতামস পাছে মোগলকে স্বরাজ্যে ডাকিয়া আনা হয়, এই ভয়ে কাহাকেও তাঁহার রাজ্যে স্থান দেন নাই। আলতামস ২৫ বৎসর বেশ যোগ্যতার সহিত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি সমুদায় আর্য্যাবর্ত্তকে তাঁহার অধীন করেন।

আলতামসের অপদার্থ পুত্র রোকন উদ্দীনের নাম উল্লেখ-যোগ্য নহে। রোকনউদ্দীনের পর তাঁহার ভগ্নী রজিয়া রাজপদ প্রাপ্ত হন। দিল্লীর সিংহাসনে কেবল এই একমাত্র রমণী সুলতানা নামে বসিতে পারিয়াছিলেন। এ সম্মান আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই এবং রজিয়া এই সম্মান লাভের সম্পূর্ণ উপযুক্তা ছিলেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমতী ও বিদুষী তেমনি রাজকার্য্যেও খুব নিপুণা ছিলেন। এই বিষয়ে কোন পুরুষ সম্রাটের অপেক্ষা তিনি হীন ছিলেন না। আলতামস যখন দূরে থাকিতেন, তখন পুত্রদের হস্তে না দিয়া রজিয়ার হস্তে সমস্ত কার্য্যভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। সাম্রাজ্ঞী হইয়া রজিয়া প্রতিদিন পুরুষের

বেশে রাজসভায় বসিয়া রাজকার্য্য দেখিতেন। প্রথম প্রথম রাজসভার সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল; কিছুদিন পরে তিনি অশ্বশালার রক্ষক আবিসীনিয়া দেশীয় একজন ক্রীতদাসের প্রতি এত অনুগ্রহ দেখান যে, রাজ্যের বড় বড় লোকেরা তাহাতে অতিশয় বিরক্ত হন। আলতুনিয়া নামে একজন বড় আমীর বিদ্রোহী হইয়া সেই ক্রীতদাসকে হত্যা করে। আলতুনিয়াকে শাসন করিতে গিয়া, রজিয়া বন্দী হইলেন। কিন্তু শেষে সে ব্যক্তি রজিয়ার রূপে গুণে এত মুগ্ধ হইলেন যে, রজিয়াকে বিবাহ করিয়া দুইজনে সিংহাসনে বসিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া দুইজনেই প্রাণ হারাইলেন।

ইহার পর আলতামসের পুত্র বাহরাম ও তাঁহার পৌত্র মসউদ সিংহাসনে বসেন। ইঁহাদের রাজত্ব সিংহাসনে বসা মাত্র। দুইজনেই অপদার্থ ছিলেন। তাহার পর আলতামসের আর এক পুত্র নসিরউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হন। ইঁহার মত ধার্ম্মিক, নির্ম্মলচরিত্র ব্যক্তি আর কেহ কখনও দিল্লীর সিংহাসনে বসেন নাই। ইনি কোরান লিখিয়া যে টাকা পাইতেন, তাহাতেই নিজের ব্যয় চালাইতেন; রাজকোষ হইতে কিছু লইতেন না। বাদসাহদিগের কত রাণী থাকে, তাঁহার একমাত্র রাণী ছিলেন, তিনিও দরিদ্রের মত থাকিতেন। তাঁহার একটীও দাসী ছিল না; নিজেই সকল কাজ করিতেন, নিজেই রন্ধন করিতেন, একদিন রাঁধিতে রাঁধিতে তাঁহার হাত পুড়িয়া যায়, তখন সম্রাটকে একটী দাসী রাখিবার জন্য বলিলেন। তাহাতে নসিরউদ্দীন উত্তর দেন,—"রাজ্যের ধন প্রজাদের, আমার সুখের জন্য তাহা কেন খরচ করিব ?" কাজেই দিল্লীর সাম্রাজ্ঞীর একটী দাসী জুটিল না। নসিরউদ্দীন ২০ বৎসর রাজত্ব করেন বটে, কিন্তু তাঁহার মন্ত্রী গেয়াস-উদ্দীনই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। নসিরউদ্দীন যতই কেন ভাললোক হউন না রাজ্য চালাইবার ক্ষমতা তাঁহার বেশী ছিল না। কাজেই গেয়াসের

উপর সকল বিষয়েই নির্ভর করিতে হইত। গেয়াস আলতামসের এক ক্রীতদাস ছিলেন। নসিরউদ্দীনের রাজত্বকালে মোগলেরা বার বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে; কিন্তু গেয়াসের সুবন্দোবস্তে তাহারা প্রতিবারই তাড়িত হয়। গেয়াসের প্রতাপে রাজ্যে কোথাও কাহারও মাথা তুলিবার যো ছিল না। নসিরউদ্দীন নিজের দুর্ব্বলতা ও গেয়াসের প্রতাপ দেখিয়া লজ্জিত হইতেন; কিন্তু তাহার প্রতিবিধান করিবার কোন উপায় ছিল না। নসিরউদ্দীনের মৃত্যুর পর গেয়াসই সম্রাট হন। ইনিও ২০ বৎসর রাজত্ব করেন।

গেয়াসউদ্দীন বলবন—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইনি কিরূপ কার্য্যপটু লোক ছিলেন। বিশেষতঃ রাজ্য-শাসন করিবার ইঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু প্রকৃতিতে ইনি নসিরউদ্দীনের ঠিক বিপরীত। তিনি অতি দয়ালু ও বিনীত ছিলেন; ইনি ঘোর অহঙ্কারী ও ভয়ানক নিষ্ঠুর ছিলেন। নিজে ক্রীতদাস ছিলেন, অথচ যাঁহারা নীচকুলে জন্মিয়াও কাজের গুণে বড় হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার রাজত্ব-কালে দুই একজন হিন্দু রাজা এবং বাঙ্গালার মুসলমান শাসনকর্ত্তা তঘরল বিদ্রোহী হন। গেয়াস তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, বিস্তর লোককে হত্যা করেন। ইঁহার রাজত্বকালেও মোগলেরা বারবার ভারতবর্ষে আসিতে চেষ্টা করে; কিন্তু গেয়াসের পুত্র তাহাদিগকে বার বার তাড়াইয়া দেন। অবশেষে শেষ যুদ্ধে তিনি নিজেই প্রাণ হারান। গেয়াস ভয়ানক নিষ্ঠুর হইলেও পুত্রশোক তাঁহার প্রাণে বড়ই লাগে এবং সেই শোকে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। গেয়াসের সভায় বড় বড় পারসী কবি ও পণ্ডিতেরা অবস্থিতি করিতেন। গেয়াসের যখন মৃত্যু হয়, তখন, তাঁহার একমাত্র পুত্র বঘরা খাঁ বাঙ্গালার নবাব ছিলেন। পিতা অসুস্থ শুনিয়া তিনি দেখিতে আসেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত না থাকিয়া চলিয়া যাওয়াতে, গেয়াস তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া

পৌত্র কায়খুসরুকে রাজ্য দিয়া যান। কিন্তু আমীরেরা কায়কোবাদকে মনোনীত করেন।

কায়কোবাদ—কায়কোবাদ যখন দিল্লীর সম্রাট হন, তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর মাত্র। ইনি এমন বিলাসী ও অপদার্থ ছিলেন যে, ইঁহার নাম মুখে আনিবার অযোগ্য। সম্রাট হইয়া কোথায় রাজকার্য্য দেখিবেন, না যত পাপ, যত মন্দ কার্য্যে রাত্রি দিন ডুবিয়া থাকিতেন। তাঁহার মন্ত্রী নিজামউদ্দিন অতিশয় দুষ্ট লোক ছিল; সে কেবল সম্রাটকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করিত। মানুষের শরীরে কি এত অত্যাচার সহ্য হয়; অচিরে তাঁহার পক্ষাঘাত রোগ হইল। পুত্রের দুর্গতির কথা শুনিয়া, বঘরা খাঁ বাঙ্গালা-দেশ হইতে আসিলেন। মন্ত্রী বলিল, পুত্র যখন দিল্লীর সম্রাট, তখন তাঁহাকে সম্রাটের মত সম্মান করিতে হইবে। তাহা না হইলে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না। বঘরা খাঁ কি করেন, পুত্রের মঙ্গলের জন্য তাহাতেই সম্মত হইলেন। পুত্র সিংহাসনে আসীন; পিতা সেলাম করিতে করিতে আসিতেছেন। পুত্র স্থিরভাবে বসিয়া আছে দেখিয়া, বঘর খাঁ আর থাকিতে পারিলেন না; কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন কায়কোবাদের মন গলিয়া গেল, এবং সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতার গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত; ভাল হওয়া তাঁহার সাধ্য ছিল না। বঘরা খাঁ বেগতিক দেখিয়া, বাঙ্গালায় ফিরিলেন। পুত্র আবার পাপে ডুবিল। অবশেষে কায়কোবাদের চক্ষু ফুটিল; দুষ্ট মন্ত্রী তাঁহার সর্ব্বনাশ করিয়াছে বুঝিলেন এবং তাহাকে হত্যা করিয়া নিজেও হত হইলেন। এইরূপে দুরাচারের পাপজীবনের শেষ হইল। কায়কোবাদের মৃত্যুর সঙ্গে দাসবংশ লোপ হইল। এই বংশে যে কয়জন রাজা উপযুক্ত ছিলেন (কুতব, আলতামস; গেয়াসুদ্দীন) তাহারা সকলেই ক্রীতদাস। যথার্থই ইহা দাস বংশ।

খিলজীবংশ।

১। জলালুদ্দীন ১২৮৮—১২৯৫
২। আলাউদ্দীন ১২৯৫—১৩১৬
৩। মোবারক ১৩১৬—১৩২১

জলালুদ্দীন—জলালুদ্দীন কায়কোবাদকে ও তাঁহার শিশুপুত্রকে হত্যা করিয়া রাজা হন; তাঁহার নামে এই অপবাদ আছে বটে, কিন্তু সম্রাট হইয়া তিনি যেরূপ ব্যবহার করেন, তাহাতে একথা বিশ্বাস হয় না। তিনি অপরাধীদিগকে কিছুমাত্র শাস্তি দিতেন না। যুদ্ধে শত্রুদিগকে বন্দী না করিয়া নিরাপদে ছাড়িয়া দিতেন। একবার মোগলদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সদলে ভারত হইতে নিরাপদে যাইতে দেন। তাঁহার অপরিসীম ক্ষমা ও দয়া দেখিয়া, রাজ্যে দুষ্ট লোকদিগের উপদ্রব বাড়িয়া গেল। রাজ্যে ছোট বড় সকলে ঘোর যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিল; কাজেই চারিদিকে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দিল। জলালুদ্দিনের ভ্রাতুস্পুত্র আলাউদ্দীন তাঁহার রাজত্ব সময়ে বিন্ধ্যাচল পার হইয়া, মহারাষ্ট্র দেশের রাজধানী দেবগিরি আক্রমণ করেন (১২৯৭ খৃঃ অঃ)। ইহার পূর্ব্বে মুসলমানেরা দাক্ষিণাত্যে পদার্পণ করেন নাই। আলাউদ্দীন ফিরিয়া আসিলে, জলালুদ্দীন তাঁহাকে যেই আলিঙ্গন করিলেন, অমনি দুষ্ট তাঁহার প্রাণ বধ করিল। জলালের রাজত্ব সময়ে একটী বড় আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে। সিদ্দিমওলা নামে এক-জন পারস্য দেশীয় ফকীর দিল্লীতে আসিয়া বাস করেন, এবং সেখানে একটী বিদ্যালয় ও পান্থশালা স্থাপন করেন। নিজে সামান্য ফকিরের মত থাকিতেন; কিন্তু শত সহস্র দরিদ্র লোককে রাশি রাশি টাকা দান করিতেন। তাঁহার অন্নছত্রে কত লোক আহার পাইত। লোকে তাঁহার দান ধ্যান দেখিয়া অবাক্ হইত। তিনি এত টাকা কোথায়

যে পাইতেন, তাহার সন্ধান কেহই জানিত না। নানা লোকে নানা কথা বলিত ;—কেহ বলিত, তাঁহার পরশ পাথর আছে ; কেহ বলিত তিনি মন্ত্রতন্ত্র জানেন। এইরূপে সকলেই তাঁহাকে এক আশ্চর্য্য পুরুষ ভাবিত। ক্রমে সম্রাটের কাণে সিদ্দিমওলার কথা উঠিল ; তিনি তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও অগাধ সম্পত্তির কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন। শেষে লোকে গুজব তুলিল,—সিদ্দিমওলা সহজ ব্যক্তি নহেন ; সম্রাটকে হত্যা করিয়া নিজে সম্রাট হইবার জন্য জাল পাতিয়াছেন। জলালের মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল ; তিনি সিদ্দিমওলাকে বন্দী করিলেন। তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইতেছে, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সম্রাটের সাক্ষাতেই মওলাজীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া হত্যা করিল। যখন তাঁহার প্রাণ বাহির হয়, তখন তিনি বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বর জানেন আমি নিরপরাধী, তিনিই ইহার প্রতিশোধ লইবেন ; তাঁহার অভিসম্পাৎ সম্রাটের উপর ও তাঁহার রাজ্যে পাড়িবেই পড়িবে।" আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তৎক্ষণাৎ এমন ঘূর্ণিবায়ু ও ঝড় আসিল যে, চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল। সম্রাট ভয়ে স্তব্ধ হইয়া গেলেন এবং অচিরে তিনি আলাউদ্দীনের হাতে প্রাণ হারাইলেন এবং সেই বৎসরেই দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইল। সকলেই ভাবিল সাধুর অভিসম্পাতে ঐরূপ ঘটিয়াছে।

আলাউদ্দীন—জলালুদ্দীনের মৃত্যুর পর আলাউদ্দীন দিল্লীর সম্রাট হইলেন। তিনি অতিশয় বীর ও কার্য্যপটু ছিলেন। দাক্ষিণাত্য জয় করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ হয়। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মলিককাফুর রামেশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করেন। আলাউদ্দীন গুজরাটের হিন্দু রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাঁহার পত্নী কমলাদেবীকে নিজের বেগম করিয়া লন। তিনি বেগমদিগের মধ্যে তাঁহাকে খুব ভালবাসিতেন। কমলাদেবীর কন্যা দেবলাদেবীকে

নিজের পুত্রের সহিত বিবাহ দেন। আলাউদ্দীন মিবারের রাজধানী চিতোর ধ্বংস করেন। তিনি শুনিয়াছিলেন, চিতোরের রাণী ভীম সিংহের স্ত্রী পদ্মিনীর মত সুন্দরী ভারতে আর নাই। ইহা শুনিয়া ভীমসিংহের পত্নাকে তাঁহার নিজের বেগম করিবার একান্ত ইচ্ছা হইল ; কিন্তু সে ত আর সহজ কথা নয়। তিনি ভিমসিংহকে বলিলেন যে, তাঁহার পত্নীর রূপের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে। রাজপুত বীরের স্ত্রী কত সম্মানের পাত্রী ! যবনের সাক্ষাতে তিনি রূপ দেখাইতে আসিবেন ? এ জঘন্য প্রস্তাবে রাণা কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন আলাউদ্দীন বিনীতভাবে বলিলেন, রাজ্ঞী যদি সম্মুখে আসিতে লজ্জা বোধ করেন, তাহা হইলে শুধু দর্পণে তাঁহার রূপের ছায়া দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া চলিয়া যাইবেন। অগত্যা তাহাই হইল। দর্পণে রাণীর অপরূপ রূপ দেখিয়া আলাউদ্দীন একেবারে মোহিত হইলেন। পরে ভদ্রতার খাতিরে ভীমসিংহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন ; তখন দুষ্ট আলাউদ্দীন তাঁহাকে বন্দী করিয়া, এই সংবাদ ঘোষণা করিলেন যে, রাণীকে না পাইলে রাজাকে ছাড়িবেন না। রাজপুতেরা বলিল রাণী সখীদের সঙ্গে লইয়া আসিতেছেন। এই বলিয়া শত শত পাল্কীতে রমণীবেশে রাজপুতবীরগণ উপস্থিত হইয়া মুসলমানদিগকে হত্যা করিয়া রাজাকে উদ্ধার করিল। ইহার পর ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাজপুতেরা পরাজিত, ভীমসিংহ হত ও চিতোর ধ্বংস হইল। পদ্মিনী জলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া দেহ ভস্মসাৎ করিলেন *।

মবারক—আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মবারক পাঁচ বৎসর রাজত্ব করেন। ইনি অতিশয় নিষ্ঠুর ও ঘোর বিলাসী ছিলেন। ইহার মন্ত্রী ইহাকে হত্যা করে।

* কোন কোন ঐতিহাসিক এই ঘটনাটী মিথ্যা বলিয়া মনে করেন।

টগলক বংশ।

১।	গেয়াস উদ্দীন	১৩২১—১৩২৫
২।	মহম্মদ	১৩২৫—১৩৫১
৩	ফিরোজ	১৩৫১—১৩৮৮
৪।	গেয়াস উদ্দীন	১৩৮৮
৫	আবুবকর	১৩৮৮—১৩৮৯
৬।	নসিরউদ্দীন	১৩৮৯—১৩৯২
৭।	মহমুদ	১৩৯২—১৪১২

গেয়াস উদ্দীন টগলক—মবারকের উজীর খসরু খাকে হত্যা করিয়া গেয়াস উদ্দীন টগলক স্বয়ং দিল্লীর সম্রাট হন। ইনি বেশ শক্তিশালী ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। যে কয় বৎসর রাজত্ব করেন, তাহাতে সকলে তাঁহার শাসনে সন্তুষ্ট ছিল।

মহম্মদ—গেয়াসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ বা মহম্মদ দিল্লীর সম্রাট হন। ইনি এত পণ্ডিত ছিলেন যে দিল্লীর সম্রাট আর কেহ এত বিদ্বান্ ছিলেন না। কিন্তু বিদ্বান্ হইলে কি হয়, ইঁহার বুদ্ধি বিবেচনা দেখিলে, ইঁহাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। মহম্মদের যখন যাহা ইচ্ছা হইত, তখন তাহাই করিতেন; ফলাফলের কথা একবার ভাবিতেন না। কি করিয়া নিজের রাজ্যের সুশাসন ও সুবন্দোবস্ত করিবেন, তাহা না ভাবিয়া, পরের রাজ্য কি করিয়া কাড়িয়া লইবেন, তাহাই ভাবিতেন। পারস্য জয় করিতে হইবে মতলব হইল, অমনি হাজার হাজার সৈন্য জড় হইল, শেষে আর তাহাদের বেতন দিতে পারেন না, কাজেই তাহারা দল ছাড়িয়া পলাইয়া দেশের চারিদিকে লুঠ পাট আরম্ভ করিল। পারস্য জয় করা হইল না তখন চীন জয় করিতে হইবে, এই খেয়াল উঠিল।

অমনি লক্ষ সৈন্য হিমালয় পার হইয়া চীন আক্রমন করিতে গেল; যুদ্ধ করা দূরে থাকুক, অগণ্য চীন সেনা দেখিয়া তাহারা ভয়ে পলাইয়া আসিল। পথ-কষ্টে, শত্রুর আক্রমণে তাহাদের ভিতর আর একজনকেও দেশে ফিরিতে হইল না।

এই প্রকার করিয়া যখন রাজকোষ শূন্য হইল, তখন মহম্মদ হুকুম দিলেন যে, তামার পয়সা রূপার দরে কাটিবে এবং টাকার বদলে নোট চলিবে। তখন লোকেরা তামার পয়সা আর নোট দিয়া কর দিতে আরম্ভ করিল। রাজকোষে রাশি রাশি পয়সা ও কাগজ আসিয়া জমা হইল। সম্রাট জব্দ হইলেন। কিন্তু টাকা ত চাই, তখন তিনি কর বাড়াইলেন। প্রজারা কর দিতে না পারিয়া, গ্রাম ছাড়িয়া বনে পলাইল এবং চুরি ডাকাতি করিয়া খাইতে লাগিল। কৃষি বাণিজ্য বন্ধ হইল। সম্রাট এই সকল দেখিয়া শুনিয়া একেবারে চটিয়া গেলেন এবং এমন সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা আরম্ভ করিলেন যে, তাহা স্মরণ করিলে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে। মানুষ শিকার করিতে হইবে, বলিয়া, দলে দলে নিরীহ কৃষকদিগকে ঘিরিয়া পশুর মত হত্যা করিতে লাগিলেন। অভাগা প্রজারা যে কি করে, ভাবিয়া পাইল না। দেশের চারিদিকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী উপস্থিত হইল; দেশ ছারখার লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। আবার খেয়াল হইল দিল্লী হইতে রাজধানী উঠাইয়া দক্ষিণাপথে দেবগিরিতে রাজধানী করিতে হইবে। দেবগিরির নাম দৌলতাবাদ হইল। দিল্লীবাসীদের উপর হুকুম হইল, সকলে দৌলতাবাদে চল; সেখানে গিয়াও নিস্কৃতি নাই; আবার বলিলেন, দিল্লীতে চল। পুনর্ব্বার দিল্লী রাজধানী হইল; আবার সকলে দিল্লীতে ফিরিয়া আসিল। এইরূপে সকল প্রজাদিগকে ধনে প্রাণে সারা করিলেন। প্রজাদিগের হাহাকারে ভারত কাঁদিয়া উঠিল। কি কুক্ষণেই পণ্ডিত মহম্মদ দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন।

পরের দেশ ত কাড়িয়া লইতে পারিলেন না, নিজের রাজ্য হারাইবার উপক্রম হইল। চারিদিকে লোকে বিদ্রোহী হইল। বাঙ্গালা, বিজয়-নগর এবং তৈলঙ্গের হিন্দু রাজারা স্বাধীন হইলেন। দাক্ষিণাত্যে হোসেন গাঙ্গু নামে একজন মুসলমান "বাহমণি" রাজ্য স্থাপন করেন (১৩৪৭ খৃঃ অঃ)। হোসেন গাঙ্গু ছোট বেলায় একজন ব্রাহ্মণের ক্রীত-দাস ছিলেন; ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি ও সততা দেখিয়া স্বাধীন করিয়া দেন। নিজে ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন বলিয়া, তাঁহার সম্মানের জন্য নিজের রাজ্যের নাম "বাহমণি" রাজ্য রাখেন। মহম্মদ দৌলতাবাদে রাজধানী স্থাপন করিলে, হোসেন গাঙ্গু তথায় এক জায়গীর লাভ করেন এবং তখন হইতে ক্রমশঃ শক্তি ও ধন লাভ করিয়া অবশেষে মহম্মদের প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তাকে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজা হন। বাহমণি রাজ্যের প্রথম রাজধানী গুলবর্গ ছিল, পরে বিদরে রাজধানী হয়। ইহার পর শতাধিক বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে বাহমণি রাজ্যের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ ছিল, কিন্তু ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বাহমণি রাজ্য ভাঙ্গিয়া দাক্ষিণাত্যে পাঁচটী স্বাধীন মুসলমান রাজ্য হয়। মহম্মদ ২৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুতে দেশে শান্তি আসিল।

মহম্মদের পরে সম্রাট ফিরোজ বেশ শান্তিতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাহার পর যে সকল সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম উল্লেখের যোগ্য নহে। তাঁহাদের রাজ্য ক্রমে আয়তনে ছোট হইতে হইতে দিল্লী এবং তাহার চারিপার্শ্বের দেশে পরিণত হইল। টগলক বংশের শেষ রাজা মহম্মদের সময়ে তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি যে পথে আসেন, কেবল লুণ্ঠন ও হত্যা করিয়া দেশকে রক্তস্রোতে ভাসাইয়াছিলেন। অবশেষে দিল্লী আসিয়া পৌছিলেন (১৩৯৮ খৃঃ অঃ)। তাঁহার আগমনের সম্বাদ পাইয়াই সম্রাট দিল্লী ছাড়িয়া

পলাইয়া যান। দিল্লীবাসীদিগের অব্যাহতি দিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাহারা দিল্লীর দ্বার খুলিয়া দিল এবং তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া গ্রহণ করিল। কিন্তু তাঁহার রক্তপিপাসু সৈন্যগণ অচিরে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিল। দিল্লীর রাজ পথ সকল রক্তের নদী হইয়া গেল। পথে এত মৃত দেহ পড়িল যে, পথ চলা বন্ধ হইয়া গেল। অগ্নিকাণ্ড ও হাহাকারে দিল্লী ফাটিয়া গেল। কিন্তু তৈমুরলঙ্গ মহা আনন্দে উৎসব করিতে লাগিলেন। পাঁচ দিন পরে, সৈন্যেরা ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল এবং সহরের অবস্থা এমন হইল যে সেখানে বাস করা অসাধ্য হইল। তখন তৈমুরলঙ্গ সেখান হইতে যাত্রা করিলেন। দিল্লীতে প্রায় এক লক্ষ লোককে তিনি হত্যা করেন। পূর্ব্বে আর এক নরশত্রু চেঙ্গিস খাঁর কথা বলিয়াছি; ইনি দ্বিতীয়। মানবজাতির এমন শত্রু পৃথিবীতে অল্পই জন্মিয়াছে। ইহার পর লোদীবংশ দিল্লীতে রাজত্ব করেন; তাঁহাদের ভিতর দুই জন ছাড়া সকলেই অতি অকর্ম্মণ্য ছিল। লোদী বংশের শেষ রাজা ইব্রাহিমের সময় তৈমুরের বৃদ্ধপ্রপৌত্র বাবর ভারতবর্ষে আসেন। তিনি পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিমকে পরাজিত করিয়া দিল্লীর রাজ্য কাড়িয়া লন। এই হইতে পাঠান রাজ্য শেষ হইয়া মোগল রাজত্ব আরম্ভ হইল।

মোগল রাজত্ব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

১।	বাবর	১৫২৬—১৫৩০
২।	হুমায়ুন	১৫৩০—১৫৫৬
৩।	আকবর	১৫৫৬—১৬০৫
৪।	জাহাঙ্গীর	১৬০৫—১৬২৭
৫।	সাজাহান	১৬২৭—১৬৫৮
৬।	আওরঙ্গজেব	১৬৫৮—১৭০৭

বাবর—বাবর যে বংশের আদি পুরুষ, তাহাকে মোগল বংশ বলে বটে, কিন্তু তাঁহার মাতাই কেবল চেঙ্গিস খাঁ মোগলের বংশে জন্মিয়াছিলেন। বাবরের মাতৃকুল মোগল হইলেও তিনি মোগল-দিগকে অতিশয় ঘৃণা করিতেন। বাবর অতিশয় বীর ও বুদ্ধিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি বার বৎসর বয়সে পিতৃহীন হইয়া, নানা প্রতিকুল ঘটনার ভিতরেও আপনার অবস্থার উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। সামান্য কষ্টে তাঁহাকে ভারতবর্ষে রাজ্য স্থাপন করিতে হয় নাই। একদিকে মুসলমান, অপর দিকে রাজপুত। এই দুইদল প্রবল শত্রুর সহিত তাঁহাকে যুঝিতে হইয়াছিল। মিবাররাজ সংগ্রামসিংহের প্রতাপে গুজরাট হইতে যমুনা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ তখন কাঁপিতেছিল। তিনি বিস্তর সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া, বাবরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। আগরার নিকট ফতেপুর

সিক্রিতে দুই দলের সাক্ষাৎ হইল। প্রথম যুদ্ধে বাবর হারিয়া যান; তাহাতে তাঁহার সেনাগণ একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে। এই সময় একজন গণক আসিয়া বলিল, বাবরের অদৃষ্টে মন্দ সময় উপস্থিত, তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন না। সেনাপতিরা পর্য্যন্ত এই সকল কথা শুনিয়া হতাশ্বাস হইল এবং অনেকে বাবরের দল ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করিল। বাবর বীর জীবনে অনেক দুঃখ কষ্ট, অনেক বিপদের মুখ দেখিয়াছেন, তাঁহার প্রাণ কিছুতেই দমিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তাহা হইলে সুরা স্পর্শ করিবেন না এবং সেই দিন হইতে তাঁহার মস্তকের চুল ও দাড়ি আর কাটিবেন না, ধার্ম্মিকের ন্যায় জীবন কাটাইবেন এবং দরিদ্রদিগকে অনেক দান করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বড় বড় সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এতদিন বীরের মত যুদ্ধ করিয়া কি বলিয়া, আজ রণে ভঙ্গ দিবে? হয় জয়লাভ, না হয় রণক্ষেত্রে শয়ন; ইহা ভিন্ন আর অন্য উপায় নাই।" তাঁহার কথায় সেনাগণ আবার উৎসাহিত হইয়া উঠিল। এইবারে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সংগ্রাম-সিংহ একেবারে পরাজিত ও বাবর জয়যুক্ত হন। ইহার কিছুদিন পরেই সংগ্রামসিংহের মৃত্যু হয়। বাবর মোটে ৪ বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন; কিন্তু এই সময় মধ্যে বাঙ্গালাদেশ পর্য্যন্ত জয় করেন। একবার বাবরের পুত্র হুমায়ুনের অতিশয় কঠিন রোগ হয়, চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত তাঁহার আরোগ্যের আশা পরিত্যাগ করেন। তখন বাবর বলিলেন, আমার জীবন দিয়া আমি পুত্রের জীবন বাঁচাইব। সকলে তাঁহাকে কত নিষেধ করিল; তিনি শুনিলেন না। হুমায়ুনের শয্যার চারিদিকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহার পর কয়েক ঘণ্টা নির্জ্জনে ঈশ্বর আরাধনায় কাটাইয়া বলিলেন, আমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তখন হইতে হুমায়ুন

আরাম হইতে লাগিলেন এবং বাবর ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া, শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পড়িলেন।

হুমায়ুন—বাবরের মৃত্যুর পর হুমায়ুন দিল্লীর সম্রাট হন। কিন্তু হুমায়ুনের ভাগ্যে দিল্লীর সিংহাসন ভোগ করা অধিক দিন ঘটে নাই। সের খাঁ নামে চুনারের একজন আফগান বীর সমস্ত বিহার জয় করিয়া, বাঙ্গালা দেশ জয় করিবার উদ্যোগ করেন। হুমায়ুন তাড়াতাড়ি চুনারের দুর্গ আক্রমণ করিলেন, এবং অনেক কষ্টে তাহা অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় সের খাঁকে আক্রমণ করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, সের খাঁ বাঙ্গালার রাজধানী গৌড় অধিকার করিয়া চুনারের দিকে ফিরিয়াছেন। হুমায়ুন গৌড় জয় করিয়া চুনারের কেল্লায় ফিরিবার পূর্ব্বেই মুঙ্গেরে সের খাঁর সহিত সাক্ষাৎ হয়। সে যুদ্ধে জয়লাভ করা দূরে থাক, অনেক কষ্টে হুমায়ুন প্রাণ লইয়া পলাইলেন। তিনি আগ্রায় গিয়া সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া, কান্যকুব্জের নিকট সের খাঁর সহিত আবার যুদ্ধ করিতে আসিলেন। এবারেও হুমায়ুন হারিয়া গেলেন (১৫৪০ খৃঃ অঃ)। প্রাণে বাঁচিলেন বটে, কিন্তু ভারত সাম্রাজ্য হারাইলেন। ভাইদের নিকট আশ্রয় চাহিলেন, তাহাও পাইলেন না; অগত্যা সিন্ধুদেশে প্রস্থান করিলেন। পথে সিন্ধুদেশের মরুভূমি পার হইবার সময়, তাঁহার কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। হুমায়ুনের যে কয়জন সঙ্গী ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকে পথে ক্ষুধা তৃষ্ণায়, দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণত্যাগ করে। তিনি রাজপুত-দিগের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন, তাহাও পান নাই। অবশেষে অনেক কষ্টে অমরকোটের দুর্গে উপস্থিত হইয়া, এক হিন্দুরাজার আশ্রয় পাইলেন। এখানে তাঁহার ভুবন বিখ্যাত পুত্র আকবর ভূমিষ্ঠ হন। (১৫৪২ খৃঃ অঃ) হুমায়ুন কত কষ্টে যে আকবরের মাতা হামিদাকে লইয়া মরুভূমি পার হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা হয় না। সেই ঘোর

দুর্দ্দিনে পুত্র রত্নের মুখ দেখিয়া হুমায়ুন ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন। দিল্লীর সম্রাট তখন এত দরিদ্র যে, সহচরদিগকে কিছু পুরস্কার দেন এমন সামর্থ্যও ছিল না। কাছে একটী মৃগনাভি ছিল, সেইটীকে ভাঙ্গিয়া বন্ধুদিগকে ভাগ করিয়া দিলেন, আর বলিলেন যে,—"ঈশ্বর" করুন ইহার সুগন্ধের ন্যায় আমার পুত্রের যশ-সৌরভ পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করুক।" ইতিহাস সাক্ষী, ঈশ্বর তাঁহার এই দুর্দ্দিনের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। হুমায়ুন সেখান হইতে পারস্যে যান। পথে তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শত্রুতা করে। পারস্যরাজের সহায়তায় সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া, তিনি ভাইদিগকে পরাজিত করিয়া কাবুলের রাজা হন; এবং ১৫ বৎসর পরে আবার যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়া দিল্লীর সিংহাসন ফিরিয়া পান (১৫৫৬ খৃঃ অঃ)। কিন্তু অচিরে সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া, তাঁহার মৃত্যু হইল। হুমায়ুনের মৃত্যুতে চৌদ্দ বৎসরের বালক আকবর দিল্লীর সম্রাট হইলেন।

হুমায়ুন যে পনর বৎসর নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, সেই কয় বৎসরে সুরবংশীয় পাঁচজন সম্রাট দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তাঁহাদের মধ্যে সের খাঁ অতি উপযুক্ত সম্রাট ছিলেন। তিনি প্রজাদের হিতার্থে অনেক ভাল কাজ করিয়াছিলেন।

আকবর—হুমায়ুনের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান সেনাপতি বৈরম খাঁ, বালক আকবরের রক্ষকরূপে সমুদায় রাজকার্য্য দেখিতেন। তাঁহাকে "খাঁ বাবা" বা সম্রাটের পিতা এই উপাধি দেওয়া হইয়াছিল। আকবরের রাজত্বের প্রথমে ইনিই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। ইনি যথার্থই অতি ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর এইরূপ সুযোগ্য পুরুষের হাতে রাজকার্য্যের ভার না পড়িলে, আকবরের যে কি বিপদ ঘটিত, তাহা বলা যায় না। যদিও সেই অল্প বয়সে আকবর তাঁহার তেজস্বিতা ও সুবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন, কিন্তু

বৈরম খাঁ না থাকিলে, শত্রুপুরী মধ্যে সেই বালক কি করিয়া প্রাণ ও রাজ্য রক্ষা করিত? যথার্থই বৈরম খাঁ হুমায়ুনের নিঃস্বার্থ বন্ধু ছিলেন। তিনি আকবরকে প্রাণের মত ভালবাসিতেন ও পিতার মত রক্ষা করিতেন। আকবরও তাঁহাকে খুব ভক্তি করিতেন। বৈরমের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজ্যের সকলে কাঁপিত। কেহ অপরাধ করিলে, তাহার আর নিস্তার ছিল না। তিনি আকবরের অতিশয় হিতকারী হইলেও তাঁহার প্রকৃতি ও ব্যবহার এরূপ নিষ্ঠুর ও কর্কশ ছিল যে, তাহা সহ্য করা আকবরের পক্ষে ক্রমে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরে পাঠান সেনাপতি হিমু আহত ও বন্দী হইয়া, যখন সম্মুখে আসিলেন, তখন বৈরম খাঁ মহা উৎসাহে বালক আকবরের হাতে তরবার দিয়া বলিলেন,—"এই বারে শত্রুর মুণ্ডপাত করিয়া, তোমার পদের গৌরব রক্ষা কর।" আকবর উত্তর করিলেন,—"বন্দী ও আহত শত্রুকে আঘাত করা আমার পক্ষে অগৌরব।" বৈরম অমনি মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আকবরের সাক্ষাতেই এক আঘাতে তাহার মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। এই সকল ব্যবহার আকবরের নিকটে অসহ্য বোধ হইল। এই প্রকারে যখন যাহা ইচ্ছা হইত বৈরম খাঁ তখন তাহাই করিতেন। ক্রমে আকবরের যখন ১৮ বৎসরের হইলেন, তখন স্থির করিলেন. খাঁ বাবার অত্যাচার দমন করিতে হইবে। তাঁহার ক্ষমতা রোধ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া খাঁ বাবার অনুপস্থিতিতে একদিন ঘোষণা করিলেন যে, তিনি স্বয়ং রাজকার্য্যের সকল ভার লইবেন, রাজ্যে তিনি ভিন্ন আর কাহারও আজ্ঞা গ্রাহ্য হইবে না। হঠাৎ আকবরের এই ভাব দেখিয়া, বৈরম খাঁ স্তম্ভিত হইলেন এবং আকবরের সন্তোষ লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বিষয়ে কৃতকার্য্য না হইয়া, পরে বিদ্রোহী হইলেন; তখন আকবর তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।

অবশেষে আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া, বৈরম খাঁ আকবরের শরণাপন্ন হইলেন। বাল্যকাল হইতেই আকবরের হৃদয় অতি মহৎ ছিল। যখন বৈরম খাঁ চরণে ধরিয়া অপরাধ স্বীকার করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে তুলিয়া নিজের পার্শ্বে বসাইয়া অনেক সমাদর করিলেন এবং বিস্তর অর্থ দিয়া তাঁহাকে মক্কা যাইতে পরামর্শ দিলেন। বৈরম খাঁ মক্কায় যাইবার পথে গুজরাটে শত্রু হস্তে প্রাণ হারাইলেন। বৈরম খাঁর মৃত্যুতে আকবর রাজ্য মধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হইলেন। কিন্তু তখনও তাঁহার রাজ্য ঘোর সঙ্কটে পূর্ণ। তিনি একে একে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যান্ত সমুদায় দেশ নিজের অধিকারে আনিলেন। গুজরাট, কাশ্মীর, বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যা সমুদায় আকবরের অধীন হইল। তিনি প্রেম এবং শাসন উভয় উপায়ে শত্রু বশ করিতেন। তাঁহার প্রকৃতিতে বীরত্ব ও কোমলতা দুই সমান ভাবে ছিল। তিনি শত্রুদিগের প্রতি কখনও নিষ্ঠুরতা করেন নাই, শত্রুকে দমন করিয়া ছাড়িয়া দিতেন। সমুদায় প্রজাদিগকে তিনি এক চক্ষে দেখিতেন, হিন্দু মুসলমান ভেদ করিতেন না। যে রাজপুতদিগকে কেহ বশ করিতে পারে নাই, তিনি সেই রাজপুত-দিগকে বন্ধুতার শৃঙ্খলে বাঁধিয়া শত্রুদিগকে পরম মিত্র করিয়া লইলেন। স্বয়ং দুইজন রাজপুত রমণীকে বিবাহ করেন এবং নিজ পুত্রকে রাজপুত কন্যার সহিত বিবাহ দেন। তোদারমল্ল, মানসিংহ প্রভৃতি রাজপুতগণ তাঁহার রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ ছিলেন। ইঁহাদের শক্তিতে তাঁহার রাজ্যের শক্তি প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি জয়পুরের, যোধপুরের এবং প্রায় সকল রাজপুত রাজাকে বশ করিতে পারিয়াছিলেন; কেবল 'মিবারের রাণা প্রতাপসিংহকে বশ করিতে পারেন নাই। প্রতাপসিংহের পিতা উদয়সিংহ যখন মিবারের রাজা তখন আকবর চিতোর ধ্বংস করেন (১৫৬৮ খৃঃ অঃ)। কথিত আছে, উদয়

সিংহ বড় কাপুরুষ ছিলেন। আকবর চিতোর আক্রমন করিলেই তিনি দুর্গ ছাড়িয়া পলাইলেন; কিন্তু তথাপি চিতোরের বীরগণ নগর ছাড়িলেন না। জয়মল্ল নামে একজন মহাবীর চিতোর রক্ষা করিতে লাগিলেন। আকবর সহজে চিতোর অধিকার করিতে পারেন নাই। একদিন রাত্রে মশাল হস্তে জয়মল্ল দুর্গের ভগ্ন স্থানগুলি মেরামত করাইতেছেন, এমন সময় অন্ধকারে দূর হইতে আকবর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিলেন। জয়মল্ল তখনি পড়িলেন। চিতোরবাসিগণ নায়কবিহীন হইল। স্ত্রীলোকেরা চিতায় দেহ ভস্ম করিল; পুরুষেরা শত্রুহস্তে প্রাণ দিল। তখন হইতে চিতোর জনহীন শ্মশান হইয়াছে। আকবরের নির্ম্মল যশে অন্যায়রূপে জয়মল্লকে হত্যা করা এক কলঙ্ক। চিতোর ধ্বংস হইল বটে, কিন্তু মিবারের রাণা বশ হইলেন না। প্রতাপসিংহ ২৫ বৎসর ধরিয়া আকবরের সহিত যুদ্ধ করিলেন, তথাপি বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। আকবর তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়া যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হন।

দাক্ষিণাত্য—সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিলে, আকবর দাক্ষিণাত্য জয়ের দিকে মন দিলেন; এবং এক সুযোগ উপস্থিত হইল। আহমদনগরের রাজাদিগের ঘরে ঘরে বিদ্বেষের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সুলতানের মৃত্যু হওয়াতে তিন চারি জন মিলিয়া সুলতান হইবার চেষ্টা করেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আকবরের সাহায্য ভিক্ষা করে। আকবর ত্বরায় স্বীয় পুত্র মোরাদকে আহমদনগরে যুদ্ধের জন্য পাঠাইলেন। আহমদনগরে বালক-সুলতানের পিতৃব্য-পত্নী চাঁদবিবী নগর রক্ষা করিতেছিলেন। ভারত ইতিহাসে এই এক অসাধারণ রমণীর কথা আমরা পড়িয়াছি। ইহার দেশের প্রতি ভালবাসা, তেজস্বিতা ও অসাধারণ বুদ্ধির কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। আকবরের শত্রুদিগের মধ্যে এক মহাবীর

ছিলেন প্রতাপসিংহ, আর এই এক বীর-নারী চাঁদ বিবী। তিনি মোগলেরা আসিতেছে শুনিয়াই, বিজয়পুরের রাজা ও সকল বিরোধী দলকে সাধারণ শত্রু দমনের জন্য মিলিত হইতে একান্ত অনুরোধ করেন। এক্ষণে তাঁহারা কিছু দিনের জন্য মিলিত হইলেন। মোগলেরা নগর জয়ের জন্য অশেষ চেষ্টা করিয়াও পারিল না। এক এক সময়ে আহমদনগরের সেনারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিত, তখন চাঁদ বিবী পুরুষের বেশে সম্মুখে আসিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন; তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহস দেখিয়া সৈন্যগণ বিপুল উৎসাহের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকে। মোগলেরা অকৃতকার্য্য হইয়া কিছুদিনের জন্য রণে ক্ষান্ত দিল। কিন্তু চাদ বিবীর এত চেষ্টা বিফল হইল। বিদ্বেষ ও বিবাদের আগুন আবার জ্বলিয়া উঠিল। কাপুরুষেরা চাঁদ বিবীকে অন্তঃপুরে রাখিয়া হত্যা করিল। এবার আকবরের সেনা-দিগের হস্তে আহমদনগর পরাজিত হইল। আকবর রাজধানী জয় করিলেন বটে, কিন্তু সমুদায় রাজ্য তাঁহাব বশ্যতা স্বীকার করিল না। আকবর কেবল খান্দেস ও বেরার পাইলেন এবং পুত্র দানিয়ালকে সেই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। আকবরের দাক্ষিণাত্য বিজয় এইখানে শেষ হইল।

আকবরের শেষ দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। আকবর যখন দাক্ষিণাত্যে, তখন শুনিলেন সেলিম বিদ্রোহী হইয়া আপনাকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া আকবর তাঁহাকে কত বুঝাইয়া মিষ্ট ভাষায় পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাকে বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত কবিলেন। আকবর আগরায় ফিরিলে, সেলিম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। আকবর মহা আদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন। আকবর পুত্রদিগকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। সেলিম

বার বার তাঁহার সহিত মন্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তথাপি আকবর বার বার তাঁহাকে ক্ষমা করেন। সেলিম অতিরিক্ত সুরাপানে স্বাস্থ্য একেবারে নষ্ট করেন; আকবর মহা চিন্তিত হইয়া, দুইজন প্রধান চিকিৎসকের হস্তে তাহার তত্ত্বাবধানের ভার দেন। কিন্তু কিছুতেই তাহার মন্দ অভ্যাস ছাড়াইতে পারিলেন না। পুত্রদিগকে লইয়া আকবর সুখী হইতে পারেন নাই। কনিষ্ঠ পুত্র দানিয়াল ঐ কু-অভ্যাসেই ৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে মারা যান। বৃদ্ধ বয়সে পুত্র-শোক আকবরের বুকে শেলের মত বিঁধিল। তিনিও অচিরে মৃত্যু-শয্যায় শুইলেন। পারিবারিক অশান্তিতে তাঁহার অন্তিম জীবন বিষময় হইয়া উঠিয়াছিল সেলিম নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র খুরমের সহিত এমন বিবাদ করেন যে, তাহাতে আকবর পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। আকবর মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন পর্য্যন্ত সেলিম পুত্রের ভয়ে পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না। আকবর সেলিমকে ডাকিয়া বলিলেন যে, তিনি ভিন্ন আর কেহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে না। আকবর শেষ মুহূর্ত্তে আমীরদিগকে নিকটে ডাকিয়া সেলিমের প্রতি বিশ্বস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন এবং সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। অপরাধী সেলিম তখন পিতার চরণে পড়িয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আকবর তাঁহাকে নিজের তরবারি দেখাইয়া তাহা লইতে আদেশ করিলেন ও বলিলেন,—"তুমি সম্রাট হইয়া পুরাতন ভৃত্যদিগকে ভুলিও না, এবং অন্তঃপুরবাসিনী রমণীদিগের প্রতি যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিও। তারপর ঈশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া চিরদিনের মত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন (১৬০৫ খৃঃ অঃ)

আকবরের মত মহৎ লোক আর কেহ কখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করেন নাই। তিনি ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। কোমলতা ও বীরত্বের এমন অপূর্ব্ব মিলন মানুষের চরিত্রে বড়ই কম দেখিতে পাওয়া যায়।

আকবর বাদসাহ ।

তাঁহার প্রকৃতি এমন মধুর ছিল যে, যে তাঁহার নিকটে আসিত, সেই মোহিত হইত। তাঁহার আকৃতিও তেমনি সুগঠিত ও সুন্দর ছিল। আকবরের শরীরে আশ্চর্য্য বল ছিল। তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতে পারিতেন। পণ্ডিত ও সাধুদিগকে আকবর বড়ই ভাল বাসিতেন। তিনি হিন্দুদিগকে যেমন ভাল বাসিতেন, তাঁহাদের ভাষাও তাঁহার তেমনি আদরের জিনিস ছিল। মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি পারসী ভাষায় অনুবাদ করান। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার আশ্চর্য্য উদারতা ছিল। তিনি নিজে এক নূতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন; কিন্তু সে ধর্ম্ম তাঁহার মৃত্যুর পরেই উঠিয়া যায়। হিন্দুদিগের অনেক কুসংস্কার দূর করিতে তিনি বিশেষ চেষ্টা করেন। সহমরণ নিষেধ করেন; বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার চেষ্টা করেন; এবং বালিকাবিবাহ প্রতিরোধ করেন। আকবরের সভায় হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খৃষ্টান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক হইত; তাহা আকবর মহা কৌতুকের সহিত শুনিতেন। তিনি অনেক সময় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেন। গীত বাদ্যেও আকবরের বড় অনুরাগ ছিল তাঁহার সভায় তানসেন নামক বিখ্যাত গায়ক ছিলেন; আকবর তাঁহাকে অতিশয় সমাদর করিতেন। পারসী কবি আবুল ফজল ও তাঁহার ভাই আকবরের অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহাদের দুজনের যদিও মুসলমান-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল না; কিন্তু ইহারা অতি সৎলোক ছিলেন। সেলিম চক্রান্ত করিয়া আবুল ফজলকে হত্যা করেন। আবুল ফজলের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া আকবর শোকে আকুল হন, এবং দুই দিন দুই রাত্রি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অবিশ্রান্ত রোদন করেন। আবুল ফজলের ভ্রাতা ফয়জীর মৃত্যু সময়ে গভীর রাত্রে শুনিলেন যে, তাঁহার শেষ সময় উপস্থিত; তৎক্ষণাৎ চিকিৎসক লইয়া তাঁহাকে

দেখিতে ছুটিলেন ; গিয়া দেখেন, তাঁহার জ্ঞান নাই, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আছেন। সে দৃশ্য দেখিয়া আকবরের চক্ষে জল আসিল ; তিনি শোকে গদগদকণ্ঠে বলিলেন,—"সেখজী চাহিয়া দেখ, চিকিৎসক আনিয়াছি ; সেখজী, একবার আমার সঙ্গে কথা কও।" কিন্তু সেখজী আর চক্ষু মেলিলেন না। তখন আকবর মুকুট মাটিতে ছুড়িয়া ফেলিলেন ও "হায় কি হইল" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। আকবর এমনি সদাশয় পুরুষ ছিলেন।

জাহাঙ্গীর—আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি লইয়া দিল্লীর সম্রাট হইলেন। জাহাঙ্গীর সম্রাট হইবার পরেই, তাঁহার পুত্র খুসরু বিদ্রোহী হইয়া লাহোর আক্রমণ করেন। জাহাঙ্গীর শীঘ্রই তাহাকে বন্দী করিলেন, এবং তাঁহার সঙ্গী ৭০০ জনকে তাঁহার সম্মুখে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিলেন। তখন হইতে খুসরু আজীবন বন্দী ভাবে দিন কাটান। আকবরের ন্যায় পিতার সঙ্গে জাহাঙ্গীর কিরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ; কিন্তু নিজের বিদ্রোহী পুত্রের প্রতি তিনি অতি নিষ্ঠুর আচরণ করেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে তাঁহার সাম্রাজ্ঞী নুরজাহানই সর্ব্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন। ইঁহার জীবনের কাহিনী অতি আশ্চর্য্য।

নুরজাহান পারস্য দেশীয় কোন রাজকর্ম্মচারীর পৌত্রী ছিলেন : দুর্দ্দৈব বশতঃ তাঁহার পিতা অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়া, দেশ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে আইসেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও দুই পুত্র ছিল। পারস্য হইতে আসিতে পথে স্ত্রী পুত্র লইয়া, অর্থভাগে অত্যন্ত কষ্টে পড়েন। সেই অবস্থায় কান্দাহারে তাঁহার একটী কন্যা হইল। তখন তাঁহাদের এমন দুরবস্থা ও তাঁহার স্ত্রীর শরীর এত দুর্ব্বল যে কন্যাটীকে লইয়া তাঁহারা আর চলিতে পারিলেন না অগত্যা

সেই সদ্যোজাতা কন্যাটীকে পথে ফেলিয়া যান। পরদিন একজন বণিক সেই পথে যাইতেছিলেন, তিনি বৃক্ষতলে অসহায় অবস্থায় সেই শিশুটীকে দেখিয়া অত্যন্ত কৃপাপরবশ হইলেন। বিশেষতঃ মেয়েটীর সুন্দর রূপ দেখিয়া, তাহার প্রতি তাঁহার মন বড় আকৃষ্ট হইল। মেয়েটীকে পালন করিবার জন্য তিনি একটা ধাত্রী খুঁজিতে লাগিলেন, এবং কিছুদূর যাইতে না যাইতে, সেই কন্যার মাতাকে ধাত্রী রূপে পাইলেন। এই কন্যাই জগদ্বিখ্যাত নুরজাহান। তখন হইতেই নুরজাহানের মাতা, পিতা ও ভ্রাতা সকলেই সেই বণিকের আশ্রয় পাইলেন এবং ইহারই সাহায্যে আকবরের রাজসভায় নুরজাহানের পিতা ও ভ্রাতা কাজ পাইলেন। সেই সময় নুরজাহান সর্ব্বদা মাতার সঙ্গে আকবরের অন্তঃপুরে যাইতেন। সেখানে সেলিম তাহাকে দেখিয়া মোহিত হন। নুরজাহানের মা সেলিমের কথা আকবরকে বলিতেন। আকবর শুনিয়া পুত্রকে তিরস্কার করেন এবং নুরজাহানকে সের আফগান নামক একজন যুবা পুরুষের সহিত বিবাহ দিয়া, বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দেন। সেলিম কিন্তু কিছুতেই নুরজাহানকে ভুলিতে পারিলেন না। সম্রাট হইয়াই বাঙ্গালার নবাবকে বলিলেন, যে কোন প্রকারেই হউক নুরজাহানকে চাই। সের আফগানের নিকট সম্রাটের ইচ্ছা বলিবামাত্র তিনি সিংহের মত লাফাইয়া উঠিলেন ও যে ব্যক্তি এমন কথা মুখে আনিয়াছিল, তাহার বুকে তৎক্ষণাই ছোরা বসাইয়া দিলেন এবং নিজেও সেইখানে আহত হন। নুরজাহানের একটী কন্যা ছিল, তাহাকে লইয়া তিনি দিল্লীতে বন্দী হইয়া আসেন এবং কিছুদিন পর তিনি জাহাঙ্গীরের সাম্রাজ্ঞী হইলেন। নুরজাহান যেমন সুন্দরী, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। সম্রাটকে একেবারে নিজের হাতের পুতুল করিয়া লইলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব নুরজাহানের রাজত্ব বলিলেই হয়। নুরজাহানের

হাতে পড়িয়া জাহাঙ্গীরের কিছু কিছু মঙ্গল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু নুরজাহানের চক্রান্তে রাজ্যে ঘোর অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নুরজাহানের কন্যার সহিত জাহাঙ্গীরের পুত্র সহরিয়ারের বিবাহ হয়, সেই অবধি নুরজাহান তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে জাহাঙ্গীরের অন্য পুত্র খুরম বিদ্রোহী হন। নুরজাহানের চক্রান্তে রাজ্যের প্রধান আমীর মহাবত খাঁ পর্য্যন্ত বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটকে বন্দী করেন। তখন নুরজাহান মহা বিপদে পড়িলেন। প্রথমে যুদ্ধ করিয়া সম্রাটকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন, তাহা না পারিয়া নানা ছলে ও কৌশলে সম্রাটকে উদ্ধার করিলেন। নুরজাহানের বুদ্ধির কাছে সকলের চাতুরী হার মানিল।

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে ইংলণ্ডের রাজার নিকট হইতে স্যার টমাস রো নামে একজন দূত ভারতবর্ষে আইসেন। তিনি সম্রাটের সভার জাঁকজমক দেখিয়া অবাক হন; কিন্তু রাজ্যে তেমন শৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত দেখিতে পান নাই। জাহাঙ্গীর ঘোর সুরাপায়ী ও অতি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি সাধ্যমত রাজকার্য্য দেখিবার চেষ্টা করিতেন বটে, কিন্তু ক্ষমতার অভাবে পারিয়া উঠিতেন না।

সাজাহান—জাহাঙ্গীরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার প্রথম দুই পুত্রের মৃত্যু হয়, সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পর খুরম সাজাহান উপাধি গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সম্রাট হন। সাজাহান সম্রাট হইয়াই সহরিয়রকে হত্যা করিলেন। সাজাহানের রাজত্ব বেশ শান্তিময় ছিল, তবে প্রথম প্রথম দাক্ষিণাত্যে কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। তাঁহার প্রধান সেনাপতি খাঁ জাহান লোদী বিদ্রোহী হইয়া, আহমদনগরের শত্রুদের সহিত মিলিত হন। প্রায় দশ বৎসরের যুদ্ধের পর আহমদনগরের বিদ্রোহের শান্তি

হয়। তখন হইতে আহমদনগর দিল্লীর অধীন হয় (১৬৩৬ খ্রীঃ অঃ)। বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য জয় করিবার জন্য সাজাহান আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে পাঠান। কিন্তু আওরঙ্গজেব পিতার অসুখের কথা শুনিয়া যুদ্ধ না করিয়াই উত্তরে ফিরিয়া আসেন। সাজাহান কান্দাহারের দিকে পৈতৃক রাজ্য ফিরিয়া পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুতেই না পারিয়া ছাড়িয়া দেন।

সাজাহান।

সাজাহানের চারিটী পুত্র ছিল—দারা, সুজা, আওরঙ্গজেব ও মোরাদ। দারার প্রকৃতি সকলের অপেক্ষা ভাল ছিল। তিনি আকবরের প্রচারিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন এবং অনেক বিষয়ে আকবরের মত ছিলেন, সাজাহান দারাকে বড় ভাল বাসিতেন এবং সকল কাজেই দারা পিতার সহায় ছিলেন। সাজাহান বিলাসী এবং কিছু অলস ছিলেন, কাজেই দারার হস্তে সকল কাজের ভার ছিল। সাজাহানের হঠাৎ একবার কঠিন পীড়া হয়, তাঁহার বাঁচিবার আশা ছিল না,

সেই সময়ে দারাই কাছে ছিলেন। পুত্রেরা যখন শুনিল, পিতার বাঁচিবার আশা নাই, তখন সকলে সিংহাসন লইবার জন্য ছুটিয়া আসিল। আওরঙ্গজেব অতিশয় ধূর্ত্ত ও কপট ছিলেন। তিনি মোরাদকে লিখিয়া পাঠাইলেন,—"ভাই আমার একান্ত ইচ্ছা তুমি বাদসাহ হও, দারা বিধর্ম্মী, তিনি সম্রাট হইলে মুসলমান ধর্ম্ম এদেশ হইতে উঠিয়া যাইবে; আমার সংসারে মন নাই; আমি ফকির হইয়া মক্কায় যাইব।" মূর্খ মোরাদ আওরঙ্গজেবের কপটতা বুঝিল না, সৈন্য সামন্ত লইয়া আওরঙ্গজেবের সহিত যোগ দিল। ওদিকে বাঙ্গালাদেশ হইতে সুজাও দারার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আসিলেন। দারা, মোরাদ ও আওরঙ্গজেবের সহিত হারিয়া প্রথমে লাহোরে ও পরে গুজরাটে পলায়ন করেন। সেখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আবার আওরঙ্গ-জেবের সহিত যুদ্ধ করেন বটে, কিন্তু আবার পরাজিত হন। সিন্ধুদেশে পলায়ন কালে এক ব্যক্তি তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের হাতে ধরাইয়া দেন আওরঙ্গজেব দারাকে বিধর্ম্মী বলিয়া হত্যা করেন। সুজাও আওরঙ্গ-জেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। নির্ব্বোধ মোরাদ অচিরে আওরঙ্গজেবের হস্তে প্রাণ হারান। আওরঙ্গজেব এই প্রকারে ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়া পিতাকে বন্দী করেন। বন্দী হইয়া সাজাহান সাত বৎসর জীবিত ছিলেন।

সাজাহানের সময়ে দিল্লীর সম্রাজ্যের ঐশ্বর্য্যের সীমা পরিসীমা ছিল না। রাজ্যের চারিদিকে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুবন্দোবস্ত ছিল। সাজাহান দিল্লীতে বিখ্যাত জুমা মসজীদ, দেওয়ান খাস, মতি মসজীদ আগরায় তাজমহল; লাহোরে সালেমার বাগান; ময়ূর সিংহাসন প্রভৃতি করিয়া কারুকার্য্যে সুরুচির পরিচয় দিয়াছিলেন। তাজমহলের নাম সকলেই শুনিয়াছ, তাহা সাহাজাহানের মহিষী মমতাজের সমাধি; ইহা নির্ম্মাণ করিতে সাজাহান দেশ দেশান্তর হইতে বিখ্যাত শিল্পী-

গণকে আনিয়াছিলেন। তাজমহল পৃথিবীতে অদ্বিতীয়। এই সকল করিতে সাজাহানের অগাধ টাকা ব্যয় হইয়াছে, অথচ ভাণ্ডার ধনে পূর্ণ ছিল; এবং প্রজারাও করভারে নিপীড়িত হয় নাই। সাজাহানের সুবন্দোবস্তের গুণে এরূপ হইয়াছিল।

আওরঙ্গজেব—আওরঙ্গজেবের সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইল। আওরঙ্গজেবের মত পরিশ্রমী, মিতাচারী ও শক্তিশালী ব্যক্তির হাতে কি করিয়া রাজ্যের অবনতি হইতে পারে, শুনিতে আশ্চর্য্য বটে; কিন্তু তাঁহার খল প্রকৃতি ও বিবেচনার অভাবে রাজ্যের মহা অনিষ্ট হইয়াছিল। আগেই বলিয়াছি, আওরঙ্গজেব বড় কপট ছিলেন; শুধু যে কপট ছিলেন তাহা নহে, তিনি নিজের মত সকলকেই ভাবিতেন, কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। মিরজুমলা নামে তাঁহার একজন পরাক্রান্ত সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার ভয়ে আওরঙ্গজেবের প্রাণে শান্তি ছিল না। সম্রাট তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার করিয়া পাঠান। মিরজুমলাই প্রথমে আসাম জয় করেন, কিন্তু তাহা রাখিতে পারেন নাই। আসামে থাকিতে থাকিতে ওলাউঠা রোগে তাঁহার প্রায় সমুদায় সৈন্য মরিয়া গেল; তখন আসামের রাজা তাঁহার প্রতি ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। তিনি কোন প্রকারে ঢাকায় পলাইয়া আসেন এবং সেখানে আসিয়াই তাঁহার মৃত্যু হয়। মিরজুমলার মৃত্যুতে আওরঙ্গজেব হাপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। আওরঙ্গজেবের আর এক দুর্ব্বুদ্ধি জোটে। তিনি গোঁড়া মুসলমান ছিলেন, কাজেই হিন্দুদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন, এবং ইহাই তাঁহার সর্ব্বনাশের মূল হইল। হিন্দুদিগের উপর আগে যে জিজিয়া কর ছিল, আকবর তাহা উঠাইয়া দেন, কিন্তু আওরঙ্গজেব আবার তাহা প্রচলিত করেন। ইহাতে রাজ্যের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত হিন্দু প্রজারা মহা বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাজপুতেরাও

বিদ্রোহী হইল, যে রাজপুতেরা আকবর ও তাঁহার পুত্র পৌত্রের রাজ্যের প্রধান বল ছিল, তাহারা এখন আওরঙ্গজেবের শত্রু হইয়া দাঁড়াইল। ওদিকে দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজীর অধীনে নূতন তেজে মাথা তুলিয়া উঠিল। মহারাষ্ট্র দেশে শিবাজী স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধি হইলে শিবাজী দিল্লীতে আওরঙ্গজেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। সেখানে আও-রঙ্গজেব শিবাজীকে এত তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও এত অনাদর করেন যে, তিনি বিরক্ত হইয়া রাজসভা হইতে চলিয়া যান। তখন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে এমন পাহারা দিতে আরম্ভ করেন যে, শিবাজী দিল্লীতে একপ্রকার বন্দী হইয়া রহিলেন। কি বা ধন্য আওরঙ্গজেব, ততোধিক ধন্য শিবাজী। একদিন পূর্ণিমায় শিবাজী ভারে ভারে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্ন বিলাইতে আরম্ভ করিলেন এবং সেই সুযোগে এক ঝাঁকার মিষ্টান্নের নীচে লুকাইয়া দিল্লী হইতে পলায়ন করিলেন এবং সেই দিন হইতে শিবাজী আওরঙ্গজেবের ঘোর শত্রু হইলেন। যদি কেহ ভবিষ্যৎ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দেখিত আওরঙ্গজেব কিরূপে সেদিন নিজের হস্তে রাজ্য ধ্বংসের বীজ রোপণ করিলেন।

আওরঙ্গজেব অনেক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া, গোলকুণ্ডা ও বিজয়পুর জয় করিলেন বটে; কিন্তু ওদিকে মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তাহারা সুবিধা পাইলেই মুসলমান সেনাদিগকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিত। অনেক দিন যুদ্ধ করিয়া আওরঙ্গ-জেবের সেনারাও বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় সুযোগ বশতঃ আওরজেব শিবাজীর পুত্র সাম্ভাজীকে বন্দী করেন। আওরঙ্গজেব সাম্ভাজীকে মুসলমান হইতে বলায়, তিনি এমন ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাবে উত্তর দেন যে, আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে হত্যা করেন। দাক্ষিণাত্যে থাকিতে থাকিতেই আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়।

ইতিহাসে আওরঙ্গজেবের সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহা বলিয়া পাঠক পাঠিকাগণ ভাবিও না যে, আওরঙ্গজেব কাপুরুষ বা দুর্ব্বল ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার খুব সাহস, খুব দৃঢ়তা ছিল, ঘোর বিপদেও তিনি ভয় পাইতেন না। এ সম্বন্ধে তিনি পিতা ও পিতামহ অপেক্ষা উচ্চ ছিলেন। আওরঙ্গজেবের এত যোগ্যতা ও এত বুদ্ধি থাকিয়াই বা কি হইল। তাঁহার কপটতা ধূর্ত্ততা ও নিষ্ঠুরতা তাঁহার সর্ব্বনাশ করিল; মিত্রকেও শত্রু করিল। আর আকবরের উদারতা, সরলতা, সততা, সৌজন্য ও দয়া ঘোর শত্রুকেও পরম মিত্র করিয়া লইয়াছিল। ভাব দেখি, স্বার্থসাধন করিতে হইলেও কোন্ উপায় শ্রেষ্ঠ।

নবম পরিচ্ছেদ।

আওরঙ্গজেবের পর যে কযজন দিল্লীর সমাট হইয়াছিলেন,
তাঁহাদিগেব নামেব তালিকা।

বাহাদুর শাহ—	১৭০৭—১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ
জাহাদাঁর শাহ—	১৭১২—১৭১৩ „
ফরুখ সের—	১৭১৩—১৭১৯ „
মহম্মদ শাহ—	১৭১৯—১৭৪৮ „
আহম্মদ শাহ—	১৭৪৮—১৭৫৪ „
দ্বিতীয় আলমগীর—	১৭৫৪—১৭৫৯ „
সাহালম—	১৭৫৯—১৮০৬ „
দ্বিতীয় আকবর—	১৮০৬—১৮৩৭ „
দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ—	১৮৩৭—১৮৫৭ „

আওবঙ্গজেবের মৃত্যুর পর যে কয়জন দিল্লীর সম্রাট হন, তাঁহারা নাম মাত্র সম্রাট ছিলেন। তাঁহাদেব ইতিহাস বিশেষ কিছু বলিবার নাই। তবে মোগল রাজ্যের পতনের সময় যে যে প্রধান ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তোমাদিগকে বলিব।

ফরুখ সের—গাজি খাঁ নামে আওরঙ্গজেবের একজন প্রিয় সেনাপতি ছিলেন। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে যে সকল যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইনিই নেতা ছিলেন। ফরুখ সেরের রাজত্ব সময়ে গাজী খাঁর পুত্র চীনক্লীচ খাঁ দাক্ষিণাত্যে হায়দারাবাদে স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপন করেন (১৭২১ খ্রীঃ)। সেই চীনক্লীচ খার বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত

নিজাম নামে খ্যাত। সম্রাটের নিকট হইতে ইনি নিজামুল মুলক উপাধী প্রাপ্ত হন।

মহম্মদ শাহ্—মহম্মদ শাহ সাদৎআলী নামক একজন মন্ত্রীকে এলাহাবাদ ও অযোধ্যার সুবাদার করিয়া পাঠান। ইনি পরে সম্রাটের উপর বিরক্ত হইয়া অযোধ্যায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। সাদৎআলী অযোধ্যার নবাবদিগের আদি পুরুষ। লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজিদআলীকে পদচ্যুত করিয়া অযোধ্যা ইংরাজরাজ্য ভুক্ত করিয়া লন (১৮৫৬ খৃঃ অঃ)।

মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে বিখ্যাত নাদীরশাহ ভারতবর্ষে আইসেন। ইনি পূর্ব্বে একজন সামান্য লোক ছিলেন; কিন্তু পরে পারস্য দেশ জয় করিয়া, সেখানকার সম্রাট হন এবং ক্রমে কাবুল পর্য্যন্ত জয় করেন (কাবুল বাবরের সময় হইতে দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিল)। অবশেষে ভারতবর্ষের দিকে তাঁহার চক্ষু পড়িল এবং ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিলেন। অযোধ্যার সাদৎআলী এবং হায়দারাবাদের নিজাম তাঁহার গতিরোধ করিতে আসেন। দিল্লীর নিকটেই এক যুদ্ধ হয়, তাহাতে নাদীরশাহ জয়লাভ করিয়া দিল্লীতে প্রবেশ করেন। মহম্মদ শাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বাদসার মস্তকে কোহিনুর দেখিয়া নাদীর শাহের বড় লোভ হইল। তিনি বলিলেন যে,—"আমাদের দেশে বন্ধুতা হইলে পরস্পর পাগড়ি বদল করিবার নিয়ম আছে; আসুন আমরা মুকুট বদল করি।" মহম্মদ শাহ তৎক্ষণাৎ কহিনুর শোভিত মুকুট নাদীর শাহের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। সেই দিন হইতে কোহিনুর দিল্লীর সম্রাটের মুকুট হইতে স্থানচ্যুত হইল। নাদীরশাহ কোহিনুর পাইয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন এবং দিন কয়েক মহম্মদ শাহের সহিত বন্ধুভাবে কাটাইলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সৈন্যদিগের সহিত দিল্লীবাসীদিগের বিবাদ হয়; এমন কি

নাদীর শাহ।

তাহারা নাদীর শাহকে পর্য্যন্ত অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়াছিল। দিল্লী-বাসীদের এই ব্যবহারে নাদীর শাহ ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন এবং সৈন্য-দিগকে দিল্লীবাসিগণকে হত্যা করিতে আজ্ঞা দিলেন। সারাদিন হত্যাকাণ্ড চলিল। মহম্মদ শাহ প্রজাদিগের রক্তপাত দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অব্যাহতি দিবার জন্য নাদীর শাহকে করযোড়ে অনুরোধ করিলেন। নাদীরশাহের আজ্ঞায় তখন হত্যাকাণ্ড স্থগিত হইল। নাদীর শাহ দিল্লীর বড় লোকদিগের বাটীতে, সম্রাটের প্রাসাদে, রাজভাণ্ডারে যত কিছু টাকা, মণিমাণিক্য দেখিলেন, সর্ব্বস্ব লইয়া গেলেন। সাজাহানের এত সাধের ময়ূর-সিংহাসন পর্য্যন্ত নিজ রাজ্যে লইয়া যান।

মহম্মদ শাহের রাজ্যের দুর্গতি এখানেই শেষ হইল না। কাবুলের

আমীর আহমদ শাহ দুরাণী এইবার ভারতবর্ষে (১৭৪৮ খৃঃ অঃ) আসেন। কিন্তু সম্রাটের পুত্র তাঁহাকে প্রথম বারে তাড়াইয়া দেন। আহমদ শাহ কিন্তু তাহার পর তিনবার ভারতবর্ষে আসেন। দ্বিতীয় বার আসিয়া লাহোর অধিকার করিয়া চলিয়া যান। তৃতীয় বারে দিল্লীতে প্রবেশ করিয়া, নাদীর শাহের মত দিল্লীবাসীদের সর্ব্বনাশ করেন। রক্তস্রোতে দিল্লীর পথ ঘাট ভাসিয়া যায়। তারপর মথুরায় গিয়া এক বড় পর্ব্বের দিনে অগণ্য হিন্দুকে হত্যা করেন। শেষবারে পাণিপথে মারাঠাদিগের (১৭৫৯ খৃঃ অঃ) সহিত যুদ্ধ হয়। এই সময়ে মারাঠারা ভারতে প্রবল শক্তি হইয়া উঠিয়াছিল; কি দাক্ষিণাত্যে, কি উত্তরে সর্ব্বত্রই মারাঠারা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল। আহমদ শাহ দুরাণী দিল্লীশ্বরের নিকট হইতে পঞ্জাব কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এখন মারাঠা অধিপতি রাঘোবা আহমদ শাহের লোকদিগকে তাড়াইয়া পঞ্জাব অধিকার করেন। এই সংবাদ শুনিয়া আহমদ শাহ মারাঠাদিগের দর্প চূর্ণ করিবার জন্য চতুর্থ বার ভারতবর্ষে আসেন মারাঠা সেনাপতি সদাশিব রাও বিস্তর সেনা লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হন। হোলকার তাঁহাকে হঠাৎ যুদ্ধ করিতে নিষেধ করেন। অযোধ্যার নবাব এবং রোহিলারা দুরাণীর সহিত যোগ দেন। সদাশিবের সেনারা কিছুদিন যুদ্ধ না করিয়া গড়খায়ের ভিতর রহিল। পরে খাদ্যদ্রব্যের অনাটন হওয়াতে যুদ্ধ করিতে বাহির হইল। যুদ্ধের প্রথমেই মারাঠারা এমন বিক্রমের সহিত আক্রমণ করিল যে, রোহিলারা তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া হটিয়া গেল। তখন দুরাণী আফগান সৈন্য লইয়া সম্মুখে আসিলেন। এইবারে আফগানদিগের হস্তে মারাঠারা পরাজিত হইল। সদাশিব রাও যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িলেন। পাণিপথের যুদ্ধে হারিয়া মারাঠারা কিছুদিনের জন্য নিষ্প্রভ হইয়া রহিল। ইতিহাসে ইহা পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ নামে খ্যাত। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীর নিকট

হইতে দিল্লী-সাম্রাজ্য কাড়িয়া লন (১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। দ্বিতীয় পাণিপথের যুদ্ধে হুমায়ুন দিল্লী-সাম্রাজ্য ফিরিয়া পান (১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দ)।

সিপাহী-বিদ্রোহের সময় দিল্লীর শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ বিদ্রোহে যোগদান করাতে, ইংরেজ বাহাদুর তাঁহাকে রেঙ্গুনে বন্দী করিয়া পাঠান। সেখানে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সঙ্গে এত দিনের দিল্লীর রাজবংশের নাম লোপ পাইল।

মুসলমানদিগের অধীনে ভারতবাসীদিগের অবস্থা—সুকুমারমতি পাঠক পাঠিকাগণ, এতক্ষণ ত তোমরা দিল্লীর সম্রাটদিগের কথা শুনিলে। এখন বল দেখি, মুসলমানদিগের সময়ে এ দেশের অবস্থা কেমন ছিল? সম্রাটদের কথা শুনিয়া তোমরা সে বিষয়ে ঠিক কিছু বুঝিতে পারিবে না, তাই সেই সম্বন্ধে তোমাদের কিছু বলিতেছি।

পাঠানদিগের রাজত্ব সময়ে প্রায় সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের অধীন হইয়াছিল, কেবল পশ্চিমে রাজপুতগণ কখনই প্রকৃত পক্ষে মুসলমানদিগের অধীন হন নাই। মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধে অনেক সময় তাঁহারা হারিয়া যাইতেন বটে, কিন্তু অধীনতা স্বীকার করেন নাই। বাবর এ দেশে আসিয়া রাজপুত-রাজ সংগ্রাম সিংহের সহিত যুদ্ধ করেন। কেবল আকবরই মুসলমান সম্রাটদিগের ভিতর প্রথমে রাজপুতদিগকে অনেকটা বশ করেন; কিন্তু সে নামমাত্র অধীনতা, প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা স্বাধীনই ছিলেন। জাহাঙ্গীর ও সাজাহান রাজপুত-দিগের সহিত সদ্ভাবে কাটান; কিন্তু আওরঙ্গজেবের সময় তাঁহারা আবার বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। ফলতঃ রাজপুতগণ কোন দিনই মুসলমানের প্রজা হন নাই। মারাঠারাই কেবল তাহাদিগকে শাসন করিতে পারিয়াছিলেন। রাজপুত ছাড়া আর্য্যাবর্ত্তের আর সমুদায় লোক মুসলমানদিগের অধীন ছিল। কি পাঠান, কি মোগল উভয় রাজত্বের সময়েই এক এক দেশে এক এক জন শাসনকর্ত্তা থাকিতেন।

সেই সকল দেশের শাসন বিষয়ে তাঁহারাই হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন. কেবলমাত্র রাজকোষে কর পাঠাইতেন; আর যুদ্ধের সময় সম্রাটকে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। কি সম্রাট, কি শাসনকর্ত্তা কি তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ সকলেই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। ইহারা ভাল হইলে প্রজাদিগের সুখ, আর অত্যাচারী হইলে প্রজাদিগের কষ্টের সীমা পরিসীমা থাকিত না। ভারতবাসীরা চিরদিন শান্ত ও নিরীহ, মুখ বুজিয়া, মাথা পাতিয়া কত যে অত্যাচার সহ্য করিয়াছে, তাহার অবধি নাই। ইউরোপের কোনও দেশে যদি ইহার শত ভাগের একভাগ অত্যাচার হইত, তাহা হইলে রাজার সিংহাসনে বসা ভার হইত। কিন্তু নানা অত্যাচার সহ্য করিলেও প্রজারা যে নিয়ত কষ্টে বাস করিত, তাহা নহে। প্রজারা অনেক সময়ে নিরুপদ্রবে, শান্তিতে আপন আপন কাজ লইয়া থাকিত। সাধারণ লোকের বিশেষ কোন কষ্ট ছিল না, তবে যিনি যত বড় তাঁর বিপদ তত অধিক ছিল। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইত, কৃষকেরা নিরুপদ্রবে বাস করিত। রাজসভার লোকেরা প্রাণ হাতে করিয়া অনেক সময় থাকিত বটে, গরীব প্রজাদের সে সব ভয় ছিল না। পাঠানদের সময় রাজ্য ততটা সুশাসন ও সুবন্দোবস্ত ছিল না; কিন্তু মোগলদের সময় তাহা অনেকটা ছিল। হিন্দুরা পরাধীন হইলেও কি পাঠান কি মোগল উভয় রাজাদের সময়েই রাজ্যে বড় বড় কাজ পাইতেন। এ সম্বন্ধে রাজারা প্রায় হিন্দু মুসলমান ভেদ করিতেন না। হিন্দু শাসনকর্ত্তা, হিন্দু সেনাপতি এ সকলের নাম আমরা শুনিতে পাই। পরাধীনতার ভিতর ইহা এক প্রধান সুখ ছিল।

দাক্ষিণাত্য—মুসলমানদিগের এ দেশে আগমনের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে দ্রাবীড়, কর্ণাট, ত্রৈলঙ্গ ও মহারাষ্ট্র এই চারিটী বড় বড় স্বাধীন রাজ্য ছিল। মুসলমানদিগের মধ্যে আলাউদ্দীন খিলজী সর্ব্ব

প্রথম দাক্ষিণাত্যে পদার্পণ করেন। সেই সময়ে মুসলমানেরা প্রথমে দাক্ষিণাত্য আক্রমণ করিলেন। হিন্দুরাজারা অনেকবার যুদ্ধে হারিয়া গেলেও দাক্ষিণাত্য একেবারে মুসলমানদিগের অধীন হয় নাই। ত্রৈলঙ্গের হিন্দুরাজ্য অনেক দিন যুদ্ধের পর স্বাধীন হয়। কর্ণাট ও দ্রাবীড়-রাজ্যের নাম কালে লোপ হইল বটে, কিন্তু সেই খানে বিজয় নগর নামে এক হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইল।

মহম্মদ টগলকের সময় মহারাষ্ট্রদেশে বাহমণী রাজ্য নামে এক নূতন মুসলমান রাজ্য হইল। তখন হইতে মহারাষ্ট্রদেশ অনেক দিন পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের অধীন রহিল। বাহমণী রাজ্যের ক্ষমতা দিন দিন বাড়িয়া উঠিল। বিজয়নগর ও ত্রৈলঙ্গের হিন্দুরাজাদিগের সহিত ইহাদিগের সর্ব্বদাই বিবাদ হইত। বাহমণীরাজগণ ক্রমে ত্রৈলঙ্গ রাজ্য গ্রাস করিলেন এবং বিজয়নগরেরও অনেক অংশ কাড়িয়া লইলেন। কিন্তু কালক্রমে এই বাহমণী রাজ্যও দুর্ব্বল হইয়া পড়িল। বাবর যখন ভারতবর্ষে আসেন, তখন বাহমণী রাজ্য ভাঙ্গিয়া দক্ষিণাপথে বিজয়পুর, আহমদনগর ও গোলকুণ্ডা এই তিনটী স্বাধীন মুসলমান রাজ্য হইয়াছিল। কিন্তু বিজয়নগরে হিন্দুরাজারা তখনও ছিলেন। মোগল সম্রাটদিগের মধ্যে আকবরই প্রথম দক্ষিণাপথ জয় করিবার চেষ্টা করেন কিন্তু এই সময়ের মধ্যেই বিজয়নগরের হিন্দুরাজ্য প্রতিবেশী মুসলমান রাজাদিগের হস্তে স্বাধীনতা হারায়। আকবর আহমদনগর জয় করিবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সাজাহানই তাহা জয় করেন। আওরঙ্গজেব অনেক বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করিয়া, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়েই দাক্ষিণাত্যে আর এক নূতন শক্তি মাথা তুলিয়া উঠিল। দাক্ষিণাত্যের সমুদায় পুরাতন মুসলমান-রাজ্য লোপ করিয়া, মহারাষ্ট্রীয়েরা দুর্জ্জয় শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে ইহাদের প্রভাব আর্য্যাবর্ত্তে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিল। ইহারাই

দিল্লীর সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন করেন। দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্র-রাজ্যের পাশাপাশি হায়দারাবাদের স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য দেখা দিল। উত্তরে দিল্লীর পতনের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবে নূতন শিখশক্তি ও অযোধ্যায় স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য স্থাপিত হইল। রোহিলখণ্ডে রোহিলারা ও ভরতপুরে জাঠেরা এই সময়ে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্রীয়জাতির উত্থান।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ,—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আওরঙ্গজেবের সময় হইতেই দিল্লীর সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হয়। ঠিক সেই সময়েই দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয়জাতি নূতন তেজে মাথা তুলিয়া উঠিল। এবং প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া ভারতের একদিক হইতে আর একদিক পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রতাপে কাঁপিতে লাগিল। এই মহারাষ্ট্রীয়জাতির নাম এই সময়ের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ইহারা আমাদিগেরই ন্যায় হিন্দুসন্তান ও ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণে বিভক্ত। উত্তরে সুরট হইতে দক্ষিণে গোয়া পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে নাগপুর ও হায়দারাবাদ হইতে পশ্চিমে আরব সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত যে ভূমি-ভাগ তাহাই ইহাদের বাসস্থান। ইহাদিগের নামানুসারে ঐ প্রদেশ মহারাষ্ট্রদেশ নামে বিখ্যাত। আওরঙ্গজেবের সময়ে এই জাতির মধ্যে ক্ষত্রিয় বংশে শিবাজী নামে একজন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ভারতের ইতিহাসে মারাঠাজাতির নাম চির-স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইহারা কলহপ্রিয় ও প্রাধান্যাভিলাষী হইলেও তাঁহার পূর্ব্বে এ জাতির সংবাদ কেহ রাখিত না। মুসলমান শাসনকর্ত্তারা তাঁহাদিগের মধ্যে বিবিধ কৌশলে বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়া, তাঁহাদিগের উপর আপনাদিগের প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। শিবাজীর হস্তে পড়িয়া ইহারা দুর্জ্জয় যোদ্ধা হইয়া দাঁড়াইলেন এবং আত্মকলহ ভুলিয়া গিয়া একতাসূত্রে বদ্ধ হইলেন। এই শিবাজীর বিষয়ে প্রথমে কিছু বলিব।

আকবরের সময় হইতে তোমরা দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর, বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা প্রভৃতি স্বাধীন মুসলমান-রাজ্যের কথা শুনিয়াছ। আওরঙ্গজেব অনেক কষ্টে বিজয়পুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য বশ করেন। তাহার পূর্ব্বে এই দুই রাজ্য স্বাধীন ছিল। শিবাজীর পিতা শাহজী আহমদনগরের অধীনে একজন জায়গীরদার ছিলেন। এই সকল মুসলমান-রাজ্যের অধীনে আরও অনেক হিন্দু জায়গীরদার ছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা বিজয়পুরের অধীন কেহ বা আহমদনগরের অধীন ছিলেন। এই সকল রাজ্যের মধ্যে পরস্পর শত্রুতা থাকাতে মারাঠা জায়গীরদারদিগের ভিতর ও পরস্পরের সহিত শত্রুতা ছিল। আহমদনগরের অধীনে দুই জন প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী জায়গীরদার ছিলেন। তাহার মধ্যে শিবাজীর পিতা শাহজী একজন ও মাতুল লুখজী যাদব রাও আর এক জন। লুখজী যে যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা তখন মারাঠাদিগের ভিতর উচ্চতম বংশ ছিল এবং ক্ষমতাতেও ইঁহারা সকলের প্রধান ছিলেন। শিবাজীর পিতামহ মালোজীর বহুকাল পর্য্যন্ত কোন সন্তান হয় নাই। কথিত আছে, শাহসরিফ নামে একজন মুসলমান পীরের প্রার্থনা বলে মালোজীর দুই পুত্র জন্মে, বড়টীর নাম শাহজী ও ছোটটীর নাম সরিফজী। মালোজী ভোঁসলে বেশ বুদ্ধিমান ও কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন, এইজন্য শীঘ্র তাঁহার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। যাদবরাও তাঁহাকে বড ভাল বাসিতেন। একদিন কোন পর্ব্ব উপলক্ষে মালোজী যাদবরাওর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যান। সেই সময় পাঁচ বৎসরের বালক শাহজীকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। শাহজী নাকি ছোটবেলায় দেখিতে বেশ সুশ্রী ছিলেন। ছেলেটীকে দেখিয়া যাদবরাওর বড় ভাল লাগিল, তিনি কাছে ডাকিয়া তাহাকে কোলে লইলেন। কোলে তাঁহার তিন বৎসরের কন্যা জীজীবাই বসিয়াছিল। তিনি হাসিয়া বলিলেন, "দেখ দুটীকে কি

সুন্দর দেখাচ্চে, এদের বিবাহ দিলে বেশ সাজে।" এই সুযোগে মালোজী বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধুগণ, তোমরা সাক্ষী, যাদবরাও আমার পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন বলিলেন।" যাদবরাও এই কথা শুনিয়া একেবারে চটিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "কি আমি ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছি মাত্র! উন্নত যদুবংশের সহিত কি ভোঁসলেবংশের কখনও মিলন হইতে পারে?" কিন্তু মালোজী ছাড়িলেন না এবং নানা উপায়ে নিজের ক্ষমতা এত বৃদ্ধি করিলেন যে, যাদবরাও তাঁহার পুত্রের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হইলেন। শাহজীর সহিত যাদবরাওর কন্যা জীজীবাইএর বিবাহ হইল। শিবাজী ইঁহাদের সন্তান। শিবাজীর পিতা শাহজী পূর্ব্বে আহমদনগরের অধীন জায়গীরদার ছিলেন এবং সে রাজ্য দিল্লীর অধীন হইলে, তিনি বিজয়-পুরের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করেন। পুণা সহরই তাহার জায়গীরের প্রধান স্থান ছিল। বিজয়পুরের সুলতান তাঁহাকে কর্ণাটকের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করিলে, তিনি তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়ায় মান্দ্রাজ প্রদেশের তাঞ্জোর অঞ্চলে নূতন জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুণার জায়গীরের ও বালক শিবাজীর ভার দাদাজী কোণ্ডদেব নামে একজন উপযুক্ত কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া, তিনি তাঞ্জোরে বাস করিতে গেলেন। দাদাজী অতি যত্নপূর্ব্বক শিবাজীকে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন, বাল্যকালেই শিবাজী ঘোড়ায় চড়িতে ও অস্ত্র চালাইতে শিক্ষা করেন। শিবাজী অতিশয় সাহসী ও নির্ভীক ছিলেন। পুণার নিকটে পর্ব্বতে মাওলী নামে যে অসভ্য জাতি ছিল, তাহাদিগকে নিজ সেনাদলভুক্ত করিয়া লইলেন এবং ইহাদের সাহায্যে চারিদিকে লুট্‌পাট্ আরম্ভ করিলেন। যতদিন দাদাজী বাঁচিয়াছিলেন, তাঁহার হাতেই পুণার জায়গীরের ভার ছিল। দাদাজীর মৃত্যুর পর শিবাজী স্বাধীনভাবে জায়গীর ভোগ করিতে লাগিলেন, পিতাকে কিছুই দিতেন না।

জায়গীরদার হইয়া শিবাজীর বল আরও বাড়িয়া গেল। তিনি বিস্তর সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করিতে লাগিলেন এবং একটী একটী করিয়া বিজয়পুর রাজ্যের দুর্গ সকল কাড়িয়া লইতে লাগিলেন। প্রথমে তোরণা শেষে সিংহগড় ও পুরন্দর দুর্গ কাড়িয়া লইলেন। রায়গড়ে নিজে এক কেল্লা করিলেন। বিজয়পুর রাজ্যের ধনরত্ন পথে যাইতেছিল, তাহা লুট করিলেন। ইহাতে বিজয়পুরের রাজা মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঞ্জোর হইতে শাহজীকে ধরিয়া আনিয়া বন্দী করিলেন। এবং বলিলেন, যতক্ষণ না শিবাজী বশীভূত হন, ততক্ষণ শাহজীকে ছাড়িবেন না এমন কি তাহার প্রাণহত্যা পর্য্যন্ত করিবেন। শাহজী বার বার বলিলেন যে তাঁহার কিছু দোষ নাই, শিবাজী তাঁহার অবাধ্য পুত্র, কিন্তু রাজা কিছুতেই শুনিলেন না। পিতার দুর্গতি শুনিয়া শিবাজী প্রথমে ভয় পাইলেন বটে, কিন্তু শেষে এক চাতুরী খেলিলেন সাজাহানকে বলিয়া পাঠাইলেন যে—"আমি আপনার অনুগত ভৃত্য এবং বিজয়পুরের পরম শত্রু। অতএব আমাকে আপনার চাকরিতে গ্রহণ করুন।" দিল্লীশ্বর তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের মনসবদার নিযুক্ত করিলেন। বিজয়পুর-রাজ এই কথা জানিতে পারিয়া ভয় পাইলেন এবং শাহজীকে ছাড়িয়া দিলেন। এখন আর শিবাজীকে পায় কে? তিনি মোগল রাজ্যেও লুটপাট আরম্ভ করিলেন। একদিন পথে দিল্লীশ্বরের তিন লক্ষ টাকা ও তিন শত ঘোড়া লুট করিলেন। শিবাজী মারাঠা সেনাদিগকে লুটপাট করিতে শিক্ষা দেন। মারাঠা ঘোড়সোয়ারকে বর্গি বলিত। শিবাজীর পরে দেড় শত বৎসর ধরিয়া এই বর্গির জ্বালায় ভারতবাসীরা অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের দেশে আজও ছেলেদের ঘুম পাড়াইবার সময় লোকে বলেঃ—

> "যাদু ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গি এলো দেশে,
> টুন টুনিকে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।"

এই বর্গির দৌরাত্ম্যেই বাঙ্গালার লোকে ঐ গান বাঁধিয়াছিল।

শিবাজী অচিরে বম্বে, গোয়া ও জিঞ্জিরা ছাড়া সমস্ত কঙ্কনদেশ অধিকার করিলেন। কঙ্কন বিজয়পুর-রাজের রাজ্য ছিল। শিবাজী তাহা কাড়িয়া লওয়াতে বিজয়পুর-পতি আফজল খাঁ নামে একজন সাহসী সেনাপতিকে শিবাজীর সহিত যুদ্ধ করিতে পাঠান। শিবাজী যাহা বলে না পারিতেন, ছলে তাহা করিতেন। তিনি আফজল খাঁর সহিত যুদ্ধ করিবেন না স্থির করিলেন। তাই বলিয়া পাঠাইলেন যে, "আপনার নাম শুনিয়া আমি বড় ভীত হইয়াছি, যুদ্ধ করিব না, সন্ধি প্রার্থনা করি।" আফজল খাঁ এই কথা শুনিয়া শিবাজীর নিকট একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। শিবাজী স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছেন, এই কথা বলিয়া এই ব্রাহ্মণটীকে হাত করিলেন; এবং আফজল খাঁর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এরূপ বন্দোবস্ত হইল। শিবাজী আফজল খাঁকে বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত, তবে আফজল খাঁর নামে তাহার এত ভয় যে সৈন্য সামন্ত সঙ্গে থাকিলে, সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহস হয় না; অতএব তিনি যেন একাকী আসেন। আফজল খাঁ সেই কথায় বিশ্বাস করিয়া, সৈন্যদিগকে দূরে রাখিয়া, কেবলমাত্র এক জন দেহ-রক্ষক লইয়া, শিবাজীর শিবিরে দেখা করিতে আসিলেন, এবং শিবাজীর অনুরোধে সেই দেহ-রক্ষকটীকে পর্য্যন্ত দ্বারদেশে রাখিয়া আসিলেন। আফজল খাঁ যোদ্ধার বেশে আসেন নাই, হস্তে কেবল একখানি ভোঁতা তরবার ছিল, কিন্তু শিবাজীর অভিসন্ধি অন্যপ্রকার। তিনি আফজল খাঁকে হত্যা করিবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হইয়া আসেন। ভিতরে বর্ম্ম পরিয়া উপরে সূতার জামা পরিয়াছিলেন, বামহস্তে বাঘনখ নামে এক প্রকার অস্ত্র লুকাইয়া রাখেন; জামার ভিতরেও বিষমাখা অস্ত্র লুকান ছিল। এইরূপে

সজ্জিত হইয়া একজন দেহরক্ষককে সঙ্গে লইয়া শিবাজী আফজল খাঁর নিকটে উপস্থিত হইলেন। শিবাজী আসিতে আসিতে পথে কতবার থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। আফজল খাঁ এইরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে বলা হইল যে, তাঁহার ভয়ে শিবাজী হঠাৎ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিতেছেন না। শিবাজী উপস্থিত হইলে আফজল খাঁ তাঁহাকে অভিবাদন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। অমনি শিবাজী তাঁহার উদরে বাঘনখ ফুটাইয়া দিলেন। শিবাজীর এই বিশ্বাসঘাতকতা দেখিয়া আফজল খাঁ হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা তাঁহাকে আঘাত করিলেন; কিন্তু শিবাজীর বর্ম্মে ঠেকিয়া উহা বিফল হইল; এবং তৎক্ষণাৎ শিবাজী তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিলেন। ইতিমধ্যে শিবাজীর দেহরক্ষক ও শিবাজীর সহিত যোগ দিল। গোলমাল শুনিয়া আফজলখাঁর দেহরক্ষক ছুটিয়া আসিয়া শিবাজীকে আক্রমন করিল; কিন্তু প্রভুকে রক্ষা করিতে পারিল না; নিজেও শিবাজীর হাতে প্রাণ হারাইল। এইরূপে ঘোর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া শিবাজী যুদ্ধের দায় হইতে বাঁচিলেন।

শিবাজীর বল ক্রমশঃ এই প্রকারে বাড়িতে লাগিল। অবশেষে রায়গড়ে রাজা হইয়া নিজের নামে টাকা চালাইতে লাগিলেন (১৬৬৪)। দিল্লীর সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু শিবাজী সন্ধি করিয়া যুদ্ধ স্থগিত করেন; সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য দিল্লীতে যান। সেখানে আওরঙ্গজেব তাঁহাকে কিরূপ-ভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন ও শিবাজী কিরূপে পলাইয়া আসেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শিবাজী দিল্লী হইতে পলাইয়া আসিয়া নিজের রাজ্যের উন্নতি ও সেনাদলের সুবন্দোবস্তের দিকে মন দিলেন। এই বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সুবিবেচনা ও বুদ্ধির পরিচয় দেন। পূর্ব্বে সকলে শিবাজীকে অগ্রাহ্য করিত; কিন্তু এখন তাঁহার ভয়ে দিল্লীর বাদশাহের

রায়গড় দুর্গ।
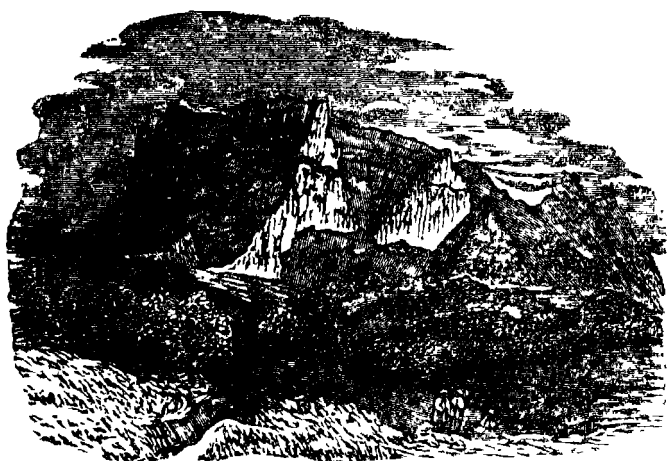
পর্য্যন্ত আতঙ্ক উপস্থিত হইল। শিবাজী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন আওরঙ্গজেব ততদিন দাক্ষিণাত্যে আসেন নাই। শিবাজীর সৈন্যগণ যখন যেখানে পড়িত সেখানেই লুটপাট করিত; কিন্তু সে সকল ধন রাজকোষে দিতে হইত। স্ত্রীলোক, ব্রাহ্মণ ও কৃষককে আক্রমণ করা, শিবাজীর বিশেষ নিষেধ ছিল। শিবাজীর অসাধারণ বুদ্ধি এবং শক্তির কথা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। পূর্ব্বে যে মারাঠাজাতি আত্মকলহে লিপ্ত ছিল, তিনি তাঁহাদিগকে একতা শিক্ষা দিয়া প্রাণে এমন এক নূতন উৎসাহ ও এমন এক নূতন শক্তির সঞ্চার করিয়া দিলেন যে, মারাঠাদিগের সাহস ও প্রতাপে সমস্ত ভারতবর্ষ কাঁপিয়া উঠিল। মুসলমান অধীনতায় হিন্দুজাতি নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়াছিল। এমন যে বীর রাজপুতগণ তাহারাও নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল; সেই সময়ে শিবাজী যেন কি এক মন্ত্রবলে মারাঠা জাতিকে জাগাইয়া তুলিলেন।

শিবাজীর মৃত্যুর পর সাম্ভাজী রাজা হন। কিন্তু ইনি শিবাজীর বড়ই

অনুপযুক্ত পুত্র ছিলেন। দিবারাত্র আমোদ প্রমোদে মত্ত থাকিতেন, রাজকার্য্য কিছুই দেখিতেন না। অবশেষে আওরঙ্গজেবের হস্তে বন্দী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সাম্ভাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রকে রাজা করা হয় এবং সাম্ভাজীর ভাই রাজারামের হস্তে রাজ্যের এবং রাজার রক্ষার ভার পড়ে। আওরঙ্গজেব কিছুদিন পরেই সাম্ভাজীর শিশুপুত্র ও তাঁহার স্ত্রীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহারা বহুকাল পর্য্যন্ত আওরঙ্গজেবের নিকট বন্দী ভাবে থাকেন। শিশুরাজা যখন বন্দী হইলেন, রাজারামই তখন রাজা হইলেন। রাজারামের সময় সেতারা রাজধানী হইল। তিনি খণ্ডেরাও দাভাডেকে গুজরাটের ও পারসজী ভোঁসলেকে বিরারের চৌথ*আদায় করিবার জন্য পাঠান। বরোদার গাইকোয়াড় ও নাগপুরের ভোঁসলা রাজাদিগের আদি পুরুষ এই দুই জন। রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় শিবাজী রাজা হন। সেই সময়ে দিল্লীর সম্রাট ঝগড়া বাধাইবার জন্য সাম্ভাজীর পুত্র শাহুকে ছাড়িয়া দিলেন; শাহু সেতারায় আসিয়া রাজা হইলেন এবং অনেকে তাঁহার দলে যোগ দিল। গৃহযুদ্ধ বাধিয়া গেল। অবশেষে রাজ্য ভাগ হইয়া গেল এবং তৃতীয় শিবাজী কোহ্লাপুরে নূতন রাজধানী করিলেন (১৭০৮ খৃঃ অঃ)। শাহু কোহ্লাপুর রাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিলে যুদ্ধ থামিয়া গেল। তখন হইতে সেতারা ও কোহ্লাপুরে শিবাজীর বংশের দুই শাখা রাজত্ব করিতে লাগিল।

শিবাজীর মৃত্যুর পরে তাঁহার বংশধরেরা তাঁহার গৌরব হারাইল। কিন্তু সমুদায় মারাঠা জাতি চারিদিকে রাজ্য বাড়াইতে লাগিল। শাহু রাজা হইয়া বালাজী বিশ্বনাথ নামে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান একজন ব্রাহ্মণকে পেশওয়া বা মন্ত্রী করিলেন। শিবাজীর বংশধরেরা হীনবল হইয়া পড়িলেন বটে, কিন্তু এই পেশওয়া এবং তাঁহার বংশধরেরা মারাঠা শক্তিকে ভারতবর্ষের চারিদিকে বিস্তৃত করিলেন।

* রাজস্বের চারিভাগের একভাগ।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পেশওয়া।
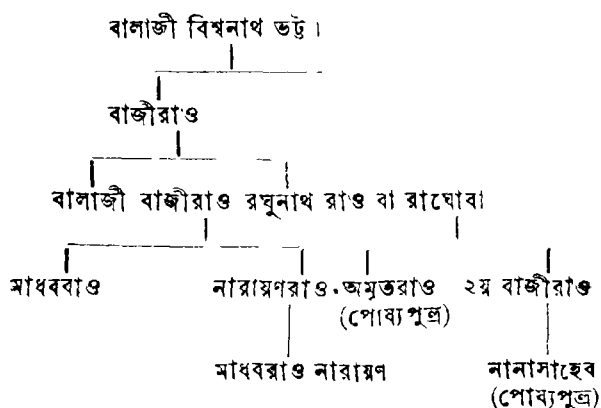
বাজীরাও—(১৭২০—১৭৪০ খৃঃ অঃ) বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট পেশওয়াদিগের আদি পুরুষ। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং রাজকার্য্য চালনা বিষয়ে বেশ পটু ছিলেন। কিন্তু মারাঠাদিগের মধ্যে তাঁহার পুত্র বাজীরাও ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শিবাজী মারাঠাজাতিকে নবশক্তি দান করেন এবং ইনি সেই শক্তিকে ভারতের চারিদিকে প্রধান শক্তি করিয়া তুলেন। বাজীরাও একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর ব্যবহারও সেইরূপ মধুর ছিল। তাঁহার বিনীত আচরণ ও মিষ্ট কথায় সকলেই মুগ্ধ হইত। বাজীরাও যেমন বুদ্ধিমান তেমনি

বীর ও যুদ্ধপটু ছিলেন। রাজকার্য্য চালনা বিষয়েও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। স্বদেশে বিদেশে তাহার অনেক শত্রু ছিল। কিন্তু শক্তিতে কেহ তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। হায়দরাবাদের নিজাম তাঁহার ঘোর শত্রু ছিলেন এবং রাজা শাহু যে তাঁহার প্রতি সকল সময় প্রসন্ন ছিলেন, তাহা নহে। কিন্তু বাজীরাওর আশ্চর্য কার্য্যকরী শক্তি ও অদ্ভুত বীরত্ব দেখিয়া, রাজা পর্য্যন্ত তাঁহার বিরুদ্ধে মুখ ফুটিতে পারিতেন না। নিজাম পদে পদে বাজীরাওকে পরাজিত করিতে চেষ্টা করিয়াও নিজেই বার বার পরাজিত হন; অবশেষে বাজীরাওর প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বাজীরাওর সময় ভারতবর্ষের ইতিহাস বড়ই জটিল। সিন্ধিয়া, হোলকার প্রভৃতি যে সকল রাজ-বংশের নাম পরে শুনিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের উৎপত্তি এই বাজীরাওর সময়েই। ইঁহারা সকলেই প্রায় বাজীরাওর অধীনে বড় বড় সেনাপতি ছিলেন।

বরোদার গাইকোয়াড়—গুজরাটের গাইকোয়াড় বংশের আদিপুরুষ পিলাজী গাইকোয়াড় গুজরাটের মারাঠা অধিপতি দাভাড়ের শিশুপুত্রের রক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। দাভাড়ের সহিত বাজীরাওর অতিশয় শত্রুতা ছিল। উভয়ে যুদ্ধ হয়, তাহাতে দাভাড়ের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর বাজীরাও পিলাজী গাইকোয়াড়ের উপর রাজকার্য্যের ভার দিলেন এবং দাভাড়ের পুত্রকে গুজরাটের অধিপতি করিলেন। কিন্তু পিলাজীর পুত্র দামাজী সমুদায় গুজরাটে আপনার অধিকার বিস্তার করিলেন। ইঁহার বংশধরই বর্ত্তমান গাইকোয়াড়।

নাগপুরের ভোঁসলে—শাহু রঘুজী ভোঁসলেকে বেরারের শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং ইনিই নাগপুরের ভোঁসলেবংশের আদিপুরুষ। ইঁহারাই আলিবর্দ্দির সময়ে বার বার বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করেন।

হোলকার ও সিন্ধিয়া—বাজীরাও নিজামের নিকট হইতে মালব রাজ্য লাভ করেন, এবং নিজের দুইজন প্রধান সেনাপতি রাণোজী সিন্ধিয়া ও মহ্লার রাও হোলকারকে সেই রাজ্য ভাগ করিয়া দেন। আজপর্য্যন্ত এই দুইরাজ্য ইংরেজদিগের মিত্ররাজ্যরূপে পরিগণিত।

বালাজী বাজীরাও—(১৭৪০—১৭৬১ খ্রীঃ) বাজীরাওর মৃত্যুর পর বালাজী বাজীরাও পেশওয়া হইলেন। ইঁহার সময় মারাঠা দিগের প্রভুত্ব যারপরনাই বাড়িয়া উঠে। ইনি অতিশয় বুদ্ধিমান, মিষ্টভাষী ও কার্য্যদক্ষ লোক ছিলেন। নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলে ও গুজরাটের দামাজী গাইকোয়াড় এই দুইজনে বালাজী বাজীরাওর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। প্রত্যেকেই মারাঠাদিগের ভিতর প্রধান হইবার জন্য চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ফলে বালাজীর সহিত কেহই পারিয়া উঠিতেন না। রঘুজী বাঙ্গালা দেশে লুট করিবার জন্য ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠান। ভাস্করপণ্ডিত বাঙ্গালার সুবাদার আলিবর্দ্দীকে হারাইয়া বাঙ্গালার বিখ্যাত ধনী জগৎশেটের বাড়ী লুট করিয়া আড়াই ক্রোর টাকা লইয়া আসেন। দিল্লীর বাদসাহ বালাজীকে রঘুজীর হস্ত হইতে বাঙ্গালাদেশ রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। বালাজী তৎক্ষণাৎ বাদসাহের অনুরোধ রক্ষা করেন। বালাজী রাওর আর এক শত্রু ছিলেন হায়দরাবাদের নিজাম। বালাজীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া, নিজাম তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হন। বালাজীর সময় রাঘোবা একদল সৈন্য লইয়া পঞ্জাব অধিকার করেন, এবং আহমদ শাহ দুরাণীর নিযুক্ত শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া, কিরূপে পাণিপথের যুদ্ধ ঘটান, পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি। বালাজী অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া আসিতেছিলেন, পথে যুদ্ধের পরাজয় সংবাদ শুনিয়া ফিরিয়া যান। এই ঘটনায় বালাজীর মনে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তিনি এত ম্রিয়মাণ, হইয়া পড়েন যে, ছয়মাসের মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

মাধব রাও—(১৭৬১—১৭৬১) বালাজীর মৃত্যুর পর, তাঁহার ১৭ বৎসরের পুত্র মাধব রাও, পেশওয়া হইলেন এবং তাঁহার পিতৃব্য রাঘোবা অভিভাবক হইলেন। কিন্তু উভয়ে অধিক দিন সদ্ভাবে কাটাইতে পারেন নাই। রঘুজী ভোঁসলে নিজামের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহাদের শত্রুতা সাধন করেন। কিন্তু রাঘোবা যুদ্ধে উভয়কে পরাজিত করেন। ওদিকে মাধব রাও মহীসুরের হায়দর আলীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ৩২ লক্ষ টাকা আদায় করেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া মাধব রাও সিবাজী কৃষ্ণ নামে এক জন সেনাপতিকে উত্তরে রাজ্য বিস্তারের জন্য পাঠান। সিবাজী হোলকার ও সিন্ধিয়ার সহিত মিলিত হইয়া, রাজপুত, রোহিলা ও জাঠদিগকে আক্রমণ করেন; এবং দিল্লীর বাদসাহকে ইংরেজদিগের আনুগত্য ত্যাগ করিয়া, এলাহাবাদ হইতে দিল্লীতে আসিয়া বাস করিতে বলেন। মাধব রাও পেশওয়ার যক্ষ্মা রোগে অসময়ে মৃত্যু হয়। মাধব রাও যদি আরও কিছুদিন ভাল থাকিতেন, তাহা হইলে মারাঠাদিগের পক্ষে ভাল হইত। তিনি যেমন বীর, সাহসী, তেমনি সরল ও ন্যায়-পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার দুইজন অতি উচ্চদরের কর্ম্মচারী ছিল—রাম শাস্ত্রী ও নানা ফড়নবিশ। রাম শাস্ত্রী অতি তেজস্বী ও সৎ-লোক ছিলেন। যাহার অন্যায় দেখিতেন, তাহারই প্রতিবাদ করিতেন, কাহাকেও ভয় করিতেন না। তাঁহার সময়ে রাজসভায় ঘুষ লওয়া বা প্রবঞ্চনা করা একপ্রকার বন্ধ হইয়া যায়। যত বড় লোকই হউন না কেন, রাম শাস্ত্রীর ভয়ে কোন অন্যায় করিতে কাহারও সাহস হইত না। স্বয়ং পেশওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করিতেন। একবার মাধব রাও কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, রাজকার্য্য দেখিতে পারেন নাই। তাহাতে রাম শাস্ত্রী মহা বিরক্ত হন। মাধব রাও বলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, ধর্ম্ম কর্ম্ম আগে করিব, না রাজকার্য্য দেখিব?—

রাম শাস্ত্রী উত্তর দিলেন, "ব্রাহ্মণের ধর্ম্মই বড়, তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে ব্রাহ্মণ হইয়া রাজকার্য্যে যিনি হাত দেন, তাঁহার রাজকার্য্যই আগে দেখা উচিত; নতুবা আপনি পেশওয়ার গদী হইতে নামিয়া আসুন।" সেই দিন হইতে মাধব রাও আর কখনও রাজকার্য্যে অবহেলা করেন নাই।

মাধব রাওএর মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন; আর রাঘোবা তাঁহার রক্ষক হইলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই অতি গোপনে রাঘোবা নারায়ণকে হত্যা করেন। রাম শাস্ত্রী রাঘোবাকে সন্দেহ করিয়া বলেন যে, "আপনি দোষী কি নির্দ্দোষ তাহার বিধিমত বিচার হউক। যদি দোষী বলিয়া প্রমাণিত হন, আপনার জীবন দিয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে; নতুবা আপনার বংশের ভাল হইবে না।" কিন্তু রাঘোবা কিছুতেই রাম শাস্ত্রীর কথায় সম্মত হইলেন না; তখন শাস্ত্রীজী ক্রোধে ও ঘৃণায় অধীর হইয়া বলিলেন, "আমি আজই আপনার রাজ্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছি। আপনার মত লোকের অধীনে কখনও কার্য্য করিব না। আর যতদিন আপনি এই গদীতে বসিবেন, ততদিন পুণায় প্রবেশ করিব না।

রাঘোবা যে আশা করিয়া নারায়ণ রাওকে হত্যা করিলেন, তাহা পূর্ণ হইল না। নানা ফড়নবিশ প্রভৃতি পুরাতন কর্ম্মচারীরা নারায়ণ রাওএর মৃত্যুর পর তাঁহার যে পুত্র জন্মিল, তাহাকে মাধব রাও নারায়ণ নাম দিয়া পেশওয়া করিলেন। রাঘোবা অনন্যোপায় হইয়া বম্বের ইংরেজদিগের সাহায্য চাহিলেন, তাঁহারাও সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন, এবং এই কারণেই প্রথম মারাঠা যুদ্ধ হয় (১৭৭৫ খৃঃ) ইহার ফলাফল পরে বলা হইবে।

এই যুদ্ধের পর পুণায় আবার দুইটী দল হয়। নানা ফড়নবিশ এক দলের নেতা, আর তাঁহার পিতৃব্য অপর দলের নেতা। নানার

পিতৃব্য, রাঘোবাকে পেশওয়া করিতে বিধিমতে চেষ্টা করেন এবং হোলকারও তাঁহার সহিত যোগ দেন। এই দল বম্বে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ভিক্ষা করেন, তাঁহারাও সাহায্য করিতে সম্মত হন। এইবারে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে প্রথমে নানা ফড়নবিশ ইংরেজদিগকে হারাইয়া দেন।

নানা ফড়নবিশ।

পরে ইংরাজেরা জয়ী হইলেও শিশুপেশওয়াকেই পেশওয়াবলিয়া মানিয়া লইলেন এবং রাঘোবার তিন লক্ষ টাকা বাৎসরিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইল। এইরূপে ছয় বৎসর পরে প্রথম মারাঠা যুদ্ধের শেষ হইল (১৭৮২খৃঃঅঃ)।

অল্পবয়স্ক মাধবরাও নারায়ণকে পেশওয়া করিয়া নানা ফড়নবিশ সকল কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে নানার মত শক্তিশালী ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। উত্তরে মাধাজী সিন্ধিয়ার ক্ষমতা অত্যন্ত বাড়িয়া

উঠিয়াছিল। তিনি দিল্লীর বাদশাহকে হস্তগত করিয়া, মহা আস্ফালন করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তিনি একবার পুণাতে আসিয়া বালক পেশওয়াকে হাত করিতে চেষ্টা করেন, তাহাতে নানা বড় ক্ষুণ্ণ হন। নানা ফড়নবিশ সর্ব্বদাই মাধব রাও নারায়ণকে চক্ষে চক্ষে রাখিতেন। স্বাধীনভাবে কিছুই করিতে দিতেন না। ইহাতে বালকের এতদূর কষ্ট বোধ হইত যে, একদিন তিনি সিঁড়ির উপর হইতে লম্ফ দিয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। এই ঘটনায় নানার প্রাণে বড় লাগিল।

মাধব রাও নারায়ণের মৃত্যুর পর রাঘোবার পুত্র বাজীরাও পেশওয়া হইলেন। নানা ফড়নবিশ তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেই সময়ে মারাঠাদলপতিদিগের মধ্যে নানা ফড়নবিশের মত ক্ষমতা কাহারও ছিল না। মাধাজী সিন্ধিয়া শক্তি ও প্রতিপত্তিতে নানার দ্বিতীয় ছিলেন, এবং এই উভয়ে বেশ সদ্ভাব ছিল। হোলকার প্রভৃতি অন্য অন্য মারাঠা-দলপতিরা ইহাদিগের বিরুদ্ধে মাথা তুলিতে পারিতেন না। নানাফড়নবিশ ইংরেজদিগের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে এ দেশ হইতে তাড়াইবার চক্রান্ত করিতেছিলেন। এমন সময়ে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। নানার মৃত্যুতে মাধাজী সিন্ধিয়াই মারাঠাদিগের নেতা হইলেন এবং পেশওয়া বাজীরাওএর সকল ক্ষমতা লোপ করিয়া, তাঁহাকে একপ্রকার নিজের হাতের পুতুল করিয়া ফেলিলেন। এই সময়ে মাধাজী সিন্ধিয়াতে আর যশোবন্তরাও হোলকারে মহা বিবাদ উপস্থিত হয়। যশোবন্তরাও হোলকার বাজীরাওএর পরিবর্ত্তে অমৃতরাও বলিয়া রাঘোবার এক পোষ্যপুত্রকে পেশওয়া করিলেন। মাধাজী সিন্ধিয়া এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য ইংরেজগবর্ণমেণ্টকে মধ্যস্থ মানেন। তাঁহারা বাজীরাওকেই পেশওয়া রাখিয়া, অমৃতরাওকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা দিয়া কাশীতে পাঠাইয়া দেন। এই উপলক্ষে মারাঠা সর্দ্দারদিগের সহিত ইংরেজদিগের যে যুদ্ধ হয়, তাহা দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। কিন্তু

বাজীরাও ভিতরে ভিতরে ইংরেজদিগের শত্রুতা সাধন করিতে থাকেন। তাঁহার এই ব্যবহারে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া, পেশওয়ার ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে বাজীরাও বিরক্ত হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে রত হন। সিন্ধিয়া, হোলকার, নাগপুরের আপ্পা সাহেব প্রভৃতি পেশওয়ার সহিত যুদ্ধে যোগ দেন। ইহাই ইতিহাসে তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১৮২৬খৃঃ অ)। ইই যুদ্ধে ইংরেজদিগের জয় হইল এবং মারাঠারাই পরাজিত হইলেন।

যুদ্ধের ফল—এই হইল যে, বাজীরাওএর রাজ্য ইংরেজেরা কাড়িয়া লইলেন। কেবল সেতারার প্রতাপসিংহ নামে শিবাজীর বংশের একজনকে রাজা করিলেন; বাজীরাওকে ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিয়া, কাণপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে পাঠাইয়া দিলেন। এই বাজীরাওএর পোষ্যপুত্র নানা সাহেব সিপাহী বিদ্রোহে যোগ দিয়া, কাণপুরে যে ভয়ানক হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন, তাহা পরে বলা হইবে।

ভোঁসলে, সিন্ধিয়া, হোলকার ও গাইকোয়াড়ের রাজ্য বজায় রহিল। কিন্তু এই যুদ্ধের পর তাঁহাদের ক্ষমতা অনেকটা খর্ব্ব হইয়া গেল।

১৮৫৩খৃঃ নাগপুরের রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করেন। গাইকোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া আজ পর্য্যন্ত ইংরেজদিগের আশ্রিত হইয়া, নিরাপদে রাজ্য ভোগ করিতেছেন।

মহারাজ শিবাজী ভারতবর্ষে যে প্রবল মারাঠা শক্তিকে জাগ্রত করেন, তাহার পরিণাম এই হইল। মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ভারতবাসীর পক্ষে গৌরবের বিষয় হইত, যদি মহারাষ্ট্রীয়জাতি এই শক্তি লাভ করিয়া তাহার উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতেন। তাহা না করিয়া তাঁহারা গ্রাম নগর ধ্বংস ও ধনরত্ন লুটপাট করিয়া ভারতবাসীদিগের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত করেন। এই কারণেই সেই সময় ইংরেজশক্তির আশ্রয় পাইয়া, ভারতবাসিগণ মারাঠাদিগের অত্যাচার হইতে উদ্ধার পাইয়া শান্তিলাভ করিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

শিখজাতির বিবরণ।

১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের নিকট তালবন্তী বা নানকাণা গ্রামে শিখজাতির আদিগুরু নানকের জন্ম হয়। নানক জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম কালু ও মাতার নাম ত্রিপতা ছিল। নানকের পিতা সামান্য বণিক ছিলেন। কথিত আছে বাল্যকাল হইতেই নানক বড় শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। একটু বড় হইলে পথ দিয়া কোন সন্ন্যাসী বা ফকিরকে যাইতে দেখিলেই, নানক তাঁহাদিগকে ডাকিয়া আনিতেন। পাঁচ বৎসর বয়সে হাতে খড়ি দিয়া, তাঁহাকে পাঠশালায় দেওয়া হয়। সেখানে শিক্ষকেরা তাঁহার আশ্চর্য্য বুদ্ধি দেখিয়া অবাক্ হন, এবং পঠদ্দশাতেই তাঁহার ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি জাগ্রত হয়। তিনি সর্ব্বদাই চুপ করিয়া থাকিতেন, সর্ব্বদাই কি যেন ভাবিতেন। তাঁহার পিতা, পুত্রের এইরূপ ভাব দেখিয়া তাঁহাকে অন্যমনা করিবার জন্য গো মেষ চরাইবার ভার দিলেন; কিন্তু তাঁহার দ্বারা সে কাজ হইল না। তিনি পশুদিগকে ছাড়িয়া দিয়া গাছের তলায় ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এইরূপে কালু নানা প্রকারে চেষ্টা দেখিলেন, নানকের দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্য বা বিষয় কার্য্যে কিছুই হয় না। নানক ক্রমে আপনার প্রকৃত কাজ খুঁজিয়া পাইলেন। তিনি হিন্দু মুসলমান সকলের নিকট এক ঈশ্বরের পূজার কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। নানকের আর এক মহৎ উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্মসূত্রে হিন্দু মুসলমান দুইবিরোধীজাতিকে একত্র বন্ধন করা। অচিরে হিন্দু মুসলমান উভয়েই দলে দলে তাঁহার শিষ্য

হইতে লাগিল। ইঁহারা শিখ বা শিষ্য সম্প্রদায় নামে পরিচিত। তাঁহার মৃত্যুর পর শিখদের আরও নয় জন গুরু হইয়াছিলেন। শিখেরা পূর্ব্বে অতি নিরীহ ভাবাপন্ন ছিল। গোঁড়া মুসলমানেরা তাহাদিগের প্রতি অশেষ অত্যাচার করিত। তাহারা নীরবে সে সকল সহ্য করিত। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র খুসরু যখন বিদ্রোহী হন, তখন অনেক শিখ তাঁহার সহায় ছিল। এই অপরাধে সম্রাট প্রায় ৭০০ শিখকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন এবং লাহোর হইতে সমুদায় শিখদিগকে তাড়াইয়া দেন। এইরূপে তাড়িত হইয়া, তাহারা শতদ্রুর নিকটে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে। সম্রাট আওরঙ্গজেব অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। তিনি নবম গুরু তেগ বাহাদুরকে বন্দী করিয়া লইয়া যান এবং মুসলমান হইবার জন্য অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মত ফিরাইতে পারিলেন না। তখন একদিন সভায় তেগবাহাদুরকে আনিয়া সম্রাট বলিলেন, "যদি কোন আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম সত্য বলিব।" তেগবাহাদুর বলিলেন, "আমি আশ্চর্য্য ব্যাপার কিছুই করিতে জানি না। তবে আমার গলায় এমন এক মন্ত্র বাঁধিয়া মরিব, যাহা হইতে আশ্চর্য্য ফল ফলিবে।" এই বলিয়া এক খণ্ড কাগজে একটী মন্ত্র লিখিয়া গলায় বাঁধিয়া, তরবারির আঘাতের জন্য গলা পাতিয়া দিলেন। সম্রাটের লোকেরা তাঁহার গলায় তরবারির আঘাত করিল, মস্তক ধূলায় গড়াইয়া পড়িল। তখন সভার লোকেরা আগ্রহের সহিত সেই মন্ত্র পড়িয়া দেখিল;—তাহাতে লেখা ছিল, "সির দিয়া সের নাহি দিয়া"—অর্থাৎ প্রাণ দিলাম, কিন্তু বিশ্বাস ছাড়িলাম না।" যথার্থই সেই মন্ত্রের আশ্চর্য্য ফল ফলিল। শিখেরা গুরুর হত্যাতে ক্রোধে ও বিদ্বেষে আগুন হইয়া উঠিল; এবং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত দলে দলে মিলিতে লাগিল। তেগবাহাদুরের পুত্র দশম গুরু গোবিন্দ

পিতার মৃত্যুতে মুসলমানদিগের প্রতি জাতক্রোধ হইলেন। মুসলমান-দিগের অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য তিনি শিখদিগকে এক নবমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া, রীতিমত যোদ্ধা করিয়া তুলিলেন (১৬৭৫ খৃঃ অঃ)। পঞ্জাবের নানা স্থানে শিখদিগের আশ্রয়ের জন্য কেল্লা নির্ম্মাণ করাইলেন। মুসলমানেরা শিখদিগের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। শিখদিগের কেল্লা দখল করিয়া, গুরু গোবিন্দের পরিবার পরিজন সকলকে হত্যা করিল। গুরু গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে পলাইয়া গেলেন। সেখানে শত্রুর হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলেন। গুরু গোবিন্দ শিখদিগকে সিং উপাধি দিয়া প্রকৃত পক্ষে সিংহ করিয়া তুলিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দের মৃত্যু হইল বটে, কিন্তু শিখদিগের হুঙ্কারে পঞ্জাব কাঁপিয়া উঠিল।

বাবা নানক শিখ-ধর্ম্ম প্রচার করিয়া যান। কিন্তু গুরু গোবিন্দই শিখজাতি রূপ মহা শক্তিশালী বীরজাতির জন্মদাতা। গুরু গোবিন্দের পরে বান্দা নামে একজন নেতার অধীনে শিখেরা পূর্ব্ব পঞ্জাবে মুসল-মানদিগের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতে আরম্ভ করে। শিখেরা মুসলমান-দিগের কত মসজিদ্ চূর্ণ করিল, মোল্লাদিগকে হত্যা করিল এবং গ্রামে গ্রামে পড়িয়া গ্রামবাসীদিগকে উৎসন্ন করিল। দিল্লীর সম্রাট তাহাদিগের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। তখন তাহারা পলাইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইল। অনেক চেষ্টার পর মুসলমানেরা বান্দাকে ধরিয়া সম্রাটের নিকট আনিল। সম্রাট বান্দা এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে ভয়ানক নিষ্ঠুর-রূপে হত্যা করিলেন। তখন হইতে মুসলমানগণ শিখদিগকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু নির্ম্মূল করা দূরে থাকুক, শিখদিগের শক্তি দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। তাহারা এক এক মিছিল অর্থাৎ দল বাঁধিয়া পঞ্জাবের চারিদিকে আক্রমণ করিল। এইরূপে নাকি তাহাদিগের ১২টী দল হয়। দলের নেতারা কেল্লা

নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতর সৈন্য সামন্ত ধন সম্পত্তি রাখিতেন। এক এক মিছিলে দশ বার হাজার করিয়া যোদ্ধা থাকিত। এই সকল মিছিলের সর্দ্দারগণ বড় সামান্য ব্যক্তি ছিলেন না।

এই যে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, কর্পূরতলার রাজাদিগের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা এইরূপ এক এক মিছিলের সর্দ্দারের বংশ। পঞ্জাবের রাজা রণজিৎ সিংহের পিতামহ ছত্র সিংহ শূকর চকিয়া নামে এক মিছিলের সর্দ্দার ছিলেন। রণজিৎ সিংহ আর সকল মিছিলকে

রণজিৎ সিংহ।

আয়ত্ত করিয়া স্বয়ং পঞ্জাবের রাজা হন। মহারাজ রণজিৎ সিংহ অতি ক্ষমতাবান নরপতি ছিলেন। তিনি আফগানদিগকে পঞ্জাব হইতে তাড়াইয়া দেন এবং কাশ্মীর মূলতান প্রভৃতি স্থান সকল জয় করেন। ইউরোপীয় সেনাপতিদিগের অধীনে সুশিক্ষিত একদল সৈন্য

রচনা করেন। মহারাজ রণজিৎ সিংহের অধীনে শিখেরা প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া উঠিল। কিন্তু মহারাজ রণজিতের মৃত্যুর পর, তাহারা উপযুক্ত চালকবিহীন হইল। শিখ সৈন্যদিগের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ রোধ করা কাহারও সাধ্য ছিল না। তাহারা অকারণ ইংরেজ রাজ্যে পড়িয়া যুদ্ধ করিয়া, অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চিরদিনের মত স্বাধীনতা হারাইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ইউরোপীয়দিগের ভারতে আগমন।

আর্য্যেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক্ হইতে আসিয়া, এদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। মুসলমানেরাও সেই পথে আসিয়া ভারত জয় করেন। কিন্তু আমাদের এখনকার রাজারা সমুদ্র-পথে, দক্ষিণ হইতে আসিয়া এদেশ অধিকার করেন। ইংরেজেরা এখন ভারতের রাজা, তাহা তোমরা সকলেই জান। কিন্তু তাঁহারা এদেশ জয় করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসেন নাই। বাণিজ্য করিবার জন্য ইংরেজেরা প্রথমে এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগমনের অনেক পূর্ব্বে পর্টুগীজেরা প্রথম বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসেন। অনেক দিন হইতে ইউরোপীয়দিগের এই বিশ্বাস ছিল যে, ভারতবর্ষের মত ধনরত্নে পূর্ণ দেশ পৃথিবীতে আর নাই। ভারতবর্ষ টাকার খনি, সে দেশে একবার যাইতে পারিলে, অনেক ধনরত্ন পাওয়া যাইবে। পর্টুগীজেরাই প্রথমে ভারতবর্ষে আসিবার জন্য চেষ্টা করেন। পর্টুগেলের রাজা ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে কলম্বসকে আটলাণ্টিক পার হইয়া, ভারতবর্ষে আসিবার জন্য পাঠান। কলম্বস ভারতবর্ষে না আসিয়া, আমেরিকা আবিষ্কার করেন। ইহার পূর্ব্বে কেহ আমেরিকার কথা জানিত না। যাহা হউক পর্টুগীজদিগের সে যাত্রা ভারতবর্ষে আসা হইল না। তাহার পাঁচ বৎসর পরে, লিসবন হইতে ভাসকোডিগামা ভারতবর্ষে আসেন। তিনি এবার আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া আসিলেন। আসিতে তাঁহাদের এগার মাস লাগিয়াছিল। মালবর উপকূলে কালিকট সহরে প্রথমে তাঁহারা পদার্পণ করেন এবং সেখানকার হিন্দুরাজার

সহিত বন্ধুতা করেন। তখন দাক্ষিণাত্যে আহমদনগর, বিজয়পুর, গোলকুণ্ডায় মুসলমান রাজারা ছিলেন; এবং বিজয়নগরের হিন্দুরাজার পরাক্রম সকলের অধিক ছিল। এই সময় হইতে একশত বৎসর পর্য্যন্ত পর্টুগীজেরা ভারতে অনেক প্রভুত্ব করেন। শুনা যায় তাঁহারা এদেশীয়দিগের প্রতি অনেক নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। কেবল তাঁহাদের মধ্যে এলবুকার্ক নামে এক ব্যক্তি এদেশীয়দিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক পর্টুগীজদিগের প্রতাপ বেশী দিন স্থায়ী হইল না। ওলন্দাজেরা এদেশে দেখা দিলেন। এখন পর্টুগীজদিগের নামও এদেশে কেহ জানে না। তবে আজ পর্য্যন্ত পশ্চিম উপকূলে গোয়া, দিউ, দমায়ু এই তিন স্থানে পর্টুগীজদিগের অধিকার আছে। পর্টুগীজদিগের সহিত মিলনে বঙ্গে অঞ্চলে প্রায় ৩০,০০০ আর ঢাকা, চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রায় ২০,০০০ ফিরিঙ্গির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাদিগের পদবী পর্টুগীজ এবং ধর্ম্মে ইহারা রোমান কাথলিক। কিন্তু আচার ব্যবহার ও চেহারায় এদেশীয়দিগের সহিত বিশেষ কোন তফাৎ নাই। এখন ভারতবর্ষে পর্টুগীজদিগের এই চিহ্নমাত্র আছে।

অন্যান্য ইউরোপীয়দিগের আগমন—পর্টুগীজদিগের এক শতবৎসর পরে ওলন্দাজগণ এদেশে আসেন। তাহার কিছু দিন পরে দিনেমারগণ তাঁহাদিগের পদানুসরণ করেন। ওলন্দাজদিগের চুঁচুড়া এবং দিনেমারদিগের শ্রীরামপুর প্রধান সহর ছিল। পরে ইংরেজেরা এই দুই সহরই তাঁহাদিগের নিকট হইতে লয়েন।

ইংরেজদিগের আগমন—১৬০০ খৃষ্টাব্দে একদল ইংরেজ বণিক রাণী এলিজাবেথের নিকট হইতে ভারতবর্ষে একচেটিয়া বাণিজ্য করিবার অনুমতি গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রথমবারেই তাঁহারা ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। সুমাত্রা দ্বীপে আসিয়া সেখান হইতে মরিচ কিনিয়া, জাহাজ বোঝাই করিয়া দেশে ফিরিয়া যান।

পরে তাঁহারা ভারতবর্ষের সন্ধান পান। সেই সময়ে পর্টুগীজেরা এদেশে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। কাজেই ইংরেজদিগের সহিত তাঁহাদের বিবাদ বাধিয়া যায় এবং অবশেষে পর্টুগীজেরাই যুদ্ধে হারিয়া যান। সেই সময় হইতেই ইংরেজদিগের প্রভুত্বের সূত্রপাত হয়। আহমদাবাদ ও সুরত সহরে ইংরেজেরা প্রথমে কুঠী করেন। কয়েক বৎসর পরে দিল্লীর সম্রাটের কন্যার অতি কঠিন পীড়া হয়। তখন সম্রাট সুরত হইতে কন্যার চিকিৎসার জন্য একজন ইংরেজ ডাক্তার চাহিয়া পাঠান। বটন নামে একজন ডাক্তার তথায় যান এবং সম্রাটের কন্যাকে আরোগ্য করেন। সম্রাট তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চাহিলে, তিনি বাঙ্গালায় বিনা মাশুলে কোম্পানির বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন। সম্রাট তাহাই মঞ্জুর করেন। পরে ঐ ডাক্তারেরই কৃপায় ইংরেজেরা বালেশ্বর ও পুরীতে কুঠী করিবার অনুমতি পান।

মান্দ্রাজ সহর—১৬৪০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে একটু জায়গা কিনিয়া লন। এই জমিটুকুতেই ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে প্রথম অধিকার। এখানে তাঁহাদিগের কুঠী ও এক কেল্লা হয়। কেল্লার নাম ফোর্ট সেণ্ট জর্জ্জ এবং সেই জমিটুকুই এখনকার মান্দ্রাজ সহর।

বোম্বাই সহর—ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস পর্টুগালের রাজকন্যাকে বিবাহ করিলে, বম্বে সহর যৌতুক পান এবং তিনি উহা ইংরেজ কোম্পানীকে দান করেন। ইংরেজ বণিক সেখানেও কেল্লা করিলেন। এইরূপে বম্বে ইংরেজ কোম্পানির দ্বিতীয় সহর হইল।

কলিকাতা সহর—১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সূত্রপাত হয়; আর ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহর স্থাপিত হয়।

গভর্ণর যব চার্ণক সাহেব ইহার প্রতিষ্ঠাতা। তিনি বাঙ্গালার নবাবের নিকট হইতে ১১৯৪ টাকায় কালীঘাট, স্থতানুটী ও গোবিন্দপুর নামে তিন খানি গ্রাম জমা লন; সেই তিন খানি গ্রামই এখনকার কলিকাতা সহর। রহিম খাঁ নামে একজন মুসলমান বিদ্রোহী হইলে, ইংরেজেরা ফোর্ট উইলিয়ম নামে কলিকাতায় যে কেল্লা আছে, তাহা নিম্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন। গভর্ণর চার্ণকের নাম আজ পর্য্যন্ত এ দেশের লোকে ভুলিতে পারে নাই। তাঁহার নামে বারাকপুরের নিকট চাণক গ্রাম হইয়াছে।

ফরাসীদিগের আগমন—ইংরেজদিগের চারি বৎসর পরে ফরাসীরা এদেশে বাণিজ্য করিতে আসেন। সুরতে ও পণ্ডিচেরীতে তাঁহারা কুঠী করেন। মান্দ্রাজের ৫০ ক্রোশ দক্ষিণে পণ্ডিচেরী সহর শীঘ্রই ফরাসীদিগের প্রধান সহর হইল এবং আজ পর্য্যন্ত উহাই ভারতে ফরাসীদিগের রাজধানী। ইংরেজদিগের সহিত ফরাসীদিগের চিরদিন বিবাদ। ভারতবর্ষের বাণিজ্য লইয়া দুই জাতির ভিতর আরও বিবাদ বাড়িয়া গেল।

ইংরেজ ও ফরাসীর মধ্যে ১ম যুদ্ধ—দাক্ষিণাত্যই প্রথমে ইংরেজ ও ফরাসীর যুদ্ধের লীলাভূমি ছিল। কর্ণাটের নবাব দোস্ত-আলির মৃত্যু হইলে, তাঁহার দুই জামাতা নবাব হইবার চেষ্টা করেন তাহার মধ্যে চান্দ সাহেব একজন। সেই সময় পণ্ডিচেরীতে ডুপ্লে নামে একজন অতি বুদ্ধিমান্ শাসনকর্ত্তা ছিলেন। চান্দ সাহেব ফরাসীদিগের শরণাপন্ন হন। ডুপ্লেও তাঁহাকে বিধিমতে সাহায্য করিতে ক্রটি করেন নাই। চান্দসাহেব ফরাসীদিগের শরণাপন্ন হইলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী কর্ণাটের নবাব ইংরেজদিগের সাহায্য চাহিলেন, ইংরেজরাও তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। এই সূত্র ধরিয়া ইংরেজ ও ফরাসীদিগের মধ্যে যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধে ফরাসীরা ইংরেজদিগকে পরাজিত করিয়া

কালিকটের রাজার সম্মুখে ভাস্কোডিগামা

মান্দ্রাজ কাড়িয়া লন। পর বৎসর বিলাত হইতে কয়েক খানি যুদ্ধের জাহাজ আসিলে, ইংরেজেরা পণ্ডিচেরী আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু যুদ্ধ হইতে না হইতেই ইউরোপে দুই জাতির ভিতর সন্ধি হওয়াতে ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপিত হইল। ইংরেজেরা মান্দ্রাজ ফিরিয়া পাইলেন (১৭৪৮ খৃঃ অঃ)।

ইংরেজ ফরাসীতে ২য় যুদ্ধ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ণাটের নবাবী পদ লইয়া বিবাদ উপস্থিত হইলে, চান্দ সাহেব ফরাসীদিগের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই সময় ফরাসী গভর্ণর ডুঁপ্লে এদেশীয় রাজাদিগের গৃহবিবাদের সুযোগে আপনাদিগের ক্ষমতা, ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টায় ছিলেন। এই কারণেই তিনি চান্দ সাহেবকে বিধিমতে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। ডুঁপ্লের বিশেষ চেষ্টায় চান্দসাহেব কর্ণাটের নবাব হইলেন। ওদিকে আবার হায়দরাবাদে নিজামপদ শূন্য হওয়াতে পরস্পর প্রতিদ্বন্দী দলে বিবাদ উপস্থিত হইল। সেখানেও ডুঁপ্লে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন, এবং তাঁহারই সহায়তায় মজফরজঙ্গ নিজাম হইলেন। এইরূপে কর্ণাটের নবাব ও হায়দরাবাদের নিজাম দুই জনেই ডুঁপ্লের অনুগত ব্যক্তি হইলেন। এই উপলক্ষে ডুঁপ্লে হায়দরাবাদে ও কর্ণাটে বিস্তর ক্ষমতা লাভ করিলেন। এমন কি বলিতে গেলে, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যে ডুঁপ্লে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সকল ক্ষমতা, সকল প্রভুত্ব যেন ফরাসী দিগের একচেটিয়া হইল। সেই সময়কার অবস্থা দেখিয়া কেহই মনে করিতে পারিত না যে, ফরাসীরা রাজা না হইয়া ইংরেজেরা এদেশের রাজা হইবেন। চান্দসাহেব ফরাসীদিগের সহায়তা লাভ করিলে, তাঁহার প্রতিদ্বন্দী কর্ণাটের নবাব মহম্মদ আলী ইংরেজদিগের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। ইংরেজেরা তাঁহার সাহায্যার্থ ক্লাইবের অধীনে সৈন্য পাঠাইলেন। কর্ণাটের রাজধানী আর্কট সহরে কেহ ছিল না,

সেই সুযোগে ক্লাইব সেই নগর অধিকার করিলেন। চান্দ সাহেব এই সংবাদ পাইয়াই আর্কটে আসিলেন এবং সাত সপ্তাহ ধরিয়া সেই নগর অবরোধ করিয়া রাখিলেন। ক্লাইব আশ্চর্য্য বীরত্ব, দৃঢ়তা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন।

সেই সময় আহারাভাবে ইংরেজ সৈন্যদিগের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। কিন্তু এদেশীয় সৈন্যেরা তখন ক্লাইবের প্রতি আশ্চর্য্য বিশ্বাস ও আনুগত্য দেখাইয়াছিল; নিজেরা ভাতের ফেনটুকু খাইয়া তাহারা গোরা সৈন্যদিগকে ভাত খাইতে দিত। যাহা হউক অবশেষে কষ্ট স্বীকার করিয়া ক্লাইব নগর আক্রমণ করিলেন; এবং সেই সময় হইতে ইংরেজদিগের ভাগ্য যেন ফিরিয়া গেল। ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে চান্দ সাহেব ক্রমাগত পরাজিত হইলেন এবং শীঘ্রই যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল। এই সকল ঘটনা লইয়া, তখন দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ফরাসীতে বিস্তর যুদ্ধ হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ক্লাইব ছুটী লইয়া দেশে গেলেন এবং এই দুই জাতির ভিতর সন্ধি হইল।

ডুঁপ্লে এবং তাঁহার পর বুসী নামে আর একজন ফরাসী দাক্ষিণাত্যে বিস্তর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। এমন কি সেই সময় তাঁহারা দাক্ষিণাত্যে রাজা ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্লাইব যে সকল উপায়ে এদেশে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার সন্ধান ডুঁপ্লের নিকট হইতেই শিক্ষা করেন। দেশীয়দিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইলে, তাহারা যে অতি উৎকৃষ্ট সেনা হইতে পারে, এ দৃষ্টান্ত ফরাসীরাই ইংরেজদিগকে দেখান। তারপর এদেশীয় রাজাদিগের গৃহ-বিবাদের সুযোগে কিরূপে সকল ক্ষমতা আয়ত্ত করিতে হয়, তাহাও ডুঁপ্লে ইংরেজদিগকে শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু ডুঁপ্লের সঙ্গে সঙ্গেই যেন ফরাসীদিগের সকল ক্ষমতা অন্তর্ধান করিল এবং সেই সময় ভারত-রঙ্গভূমে ইংরেজ বীর ক্লাইব অবতীর্ণ হইলেন। ডুঁপ্লের অভিসন্ধি সকল তিনি কার্য্যে পরিণত

করিলেন। ভারতে ইংরেজরাজ্যের ভিত্তি ক্লাইব প্রথম স্থাপন করেন।

ক্লাইব—অতি অল্প বয়সে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সামান্য একজন কেরাণীরূপে ক্লাইব এদেশে আসেন। ক্লাইবের পিতার

ক্লাইব।

অবস্থা ভাল ছিল না, সন্তান সন্ততি অনেকগুলি ছিল। ক্লাইবের জন্য দেশে কোন উপায় করিতে না পারিয়া, ক্লাইবের পিতা তাঁহাকে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানীর অধীনে কেরাণী করিয়া পাঠান। তাঁহারা পুত্রের আশা ভরসা এক প্রকার ত্যাগ করিয়াই পাঠাইয়াছিলেন। সেই সময়ে এদেশে আসিলে, ইংরেজদিগের শরীর একেবারে নষ্ট হইয়া যাইত। প্রথম প্রথম ক্লাইব এদেশে আসিয়া বড়ই কষ্ট পাইতেন। দুইবার আত্মহত্যা করিবার জন্য নিজের মস্তকে নিজে গুলি করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ভিতরে গুলি থাকা সত্ত্বেও দুইবার গুলি লাগিল না। তখন তিনি অবাক্ হইয়া বলিলেন—"জানি না ঈশ্বর আমাকে কোন্ কার্য্যের জন্য রক্ষা করিলেন, হয়ত আমার কিছু করিবার আছে।" বাস্তবিক ভারত ইতিহাস সে কথার জ্বলন্ত সাক্ষ্য দিতেছে, যদি সেই দিনে ক্লাইবের শেষ হইত, তাহা হইলে আজ হয়ত ভারত-ইতিহাস আর এক ছবি দেখাইত। শুনিলে অবাক হইবে, আত্মহত্যা করিয়াই ক্লাইব জীবন শেষ করিয়াছিলেন। আর্কটের যুদ্ধে প্রথমে ক্লাইব আপনার ভাবী মহত্ত্বের আভাস দিয়াছিলেন। তিনি যে সামান্য ব্যক্তি নন, তাহার আভাস সেই সময়েই প্রথম পাওয়া যায়। যুদ্ধের পর ইংরেজ ও ফরাসীতে সন্ধি হইলে, তিনি ছুটী লইয়া দেশে গমন করেন এবং বিলাত হইতে আসিয়া, মালবর উপকূলে আঙ্গ্রিয়া নামে একজন দুরন্ত জলদস্যুকে জব্দ করেন ও তাহার পর সেণ্ট ডেবিড দুর্গের সেনাপতি হইয়া তিনি কর্ণাটে আসেন।

বঙ্গে ক্লাইব—দাক্ষিণাত্যে যখন এই সকল ব্যাপার হইতেছিল, তখন বাঙ্গালায় আলিবর্দ্দি খাঁ নামে একজন উপযুক্ত নবাব রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি নামমাত্র দিল্লীর সম্রাটের অধীন ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মারাঠারা বার বার বাঙ্গালা আক্রমণ করে এবং তিনি বার বার তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। শেষে আর না পারিয়া, বাঙ্গালার চৌথ আর উড়িষ্যা মারাঠাদিগকে দান করেন। এইরূপে অনেক কষ্টে আলিবর্দ্দি খাঁ মারাঠার দৌরাত্ম্য বন্ধ করেন। তখন

L'ORIENT

কার লোকেরা মারাঠাদিগকে বর্গি বলিত। বাঙ্গালার লোকেরা বর্গির নামে কাঁপিত।

আলিবর্দ্দির মৃত্যু হইলে, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজ উদ্দোলা বাঙ্গালার নবাব হইলেন। আলিবর্দ্দির পুত্র ছিল না, তিনি সিরাজকে প্রাণের অধিক ভাল বাসিতেন, এবং সিরাজ ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তাঁহাকে বাঙ্গালার ভাবী নবাব বলিয়া কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। আলিবর্দ্দির আদরে সিরাজ শৈশবাবধি বড়ই প্রভুত্বপরায়ণ ও স্বেচ্ছাচরী হইয়া উঠিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, তিনি নাকি ইংরেজ বণিকদিগকে ভাল চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। সিরাজ যখন বাঙ্গালার নবাব হন, তখন তিনি বয়সে বালক ছিলেন বলিলেও হয়, কিন্তু আচরণে বালক ছিলেন না। তাঁহার বিলক্ষণ বুদ্ধি ছিল, কিন্তু বয়সের অভিজ্ঞতা কোথায় পাইবেন? জনকয়েক ইংরেজ বণিকের পশ্চাতে যে ব্রিটীশ জাতির প্রচণ্ড শক্তি ক্রীড়া করিতেছে, তাহা যদি বুঝিতে পারিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় ইংরেজদিগের সহিত বিবাদ বাধাইতে কুণ্ঠিত হইতেন। সেই সময়ে নবাবের বড় বড় কর্ম্মচারীদিগের ক্ষমতা অত্যন্ত অধিক ছিল; তাঁহারা প্রত্যেকেই যেন এক একটী নবাব। নবাবী আমলে হিন্দু বাঙ্গালিগণ খুব বড় বড় রাজকার্য্য করিতেন। নবাবগণ এই সকল কর্ম্মচারীদিগকে নানা প্রকারে বশে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। ইঁহাদের সহায়তা বিনা সিংহাসন রক্ষা করা বড়ই কঠিন ছিল। বৃদ্ধ আলিবর্দ্দি এ সকল বুঝিতেন এবং কৌশলপূর্ব্বক চারি দিক রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা রাজবল্লভ, জগৎশেঠ, মাণিক চাঁদ, মোহন লাল, নন্দ কুমার প্রভৃতি হিন্দুরা নবাবের বড় বড় কর্ম্মচারী ছিলেন। দেশ মধ্যে ইঁহাদের অত্যন্ত ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি ছিল। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই সিরাজের উপর বিরক্ত ছিলেন। তাহার কারণ এই যে, যত বড় কর্ম্মচারীই হউন না, সিরাজ কাহাকেও ভয়

করিতেন না এবং ত্রুটী দেখিলে শাস্তি দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। নূতন নবাবের হাতে কখন কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, এই ভয়ে সকলে সর্ব্বদাই সশঙ্কিত থাকিতেন। ফরাসীদিগের আক্রমণের ভয়ে ইংরেজেরা সে সময়ে কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিতে-ছিলেন। সিরাজ তাহা করিতে নিষেধ করেন, ইংরেজেরা শুনিলেন না। রাজবল্লভের সহিত সিরাজউদ্দৌলার অসদ্ভাব হইবার সূচনা হইবামাত্র তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস সমস্ত সম্পত্তি লইয়া, কলিকাতায় ইংরেজদিগের শরণাপন্ন হইলেন। একথা শুনিয়াই সিরাজ কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে দিবার জন্য ইংরেজদিগকে অনুরোধ করিলেন। ইংরেজেরা তাহাও শুনিলেন না। এজন্য ৫০০,০০০ সৈন্য লইয়া সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। তখন ড্রেক সাহেব কলিকাতার গভর্ণর ছিলেন। তিনি এবং অন্যান্য ইংরেজেরা জাহাজে করিয়া দক্ষিণে পলাইয়া গেলেন। কেল্লায় অল্পই সৈন্য রহিল; তাহারা আর কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে? সিরাজ অক্লেশে কেল্লা দখল করিলেন এবং ১৪৬ জন ইংরেজকে তাঁহার সৈন্যেরা একটি ছোট ঘরে বন্দী করিল। তখন দারুণ গ্রীষ্মকাল। গ্রীষ্ম, তৃষ্ণার, ঠেসা ঠেসিতে অভাগাদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। প্রাতে দ্বার খুলিয়া ভয়ানক দৃশ্য দেখা গেল! স্তূপাকার মৃতদেহ পড়িয়া আছে! দ্বার খোলা যায় না। এক রাত্রের কষ্টে সকলেই মারা পড়িয়াছে। কেবল ২৩ জন মাত্র মৃত প্রায় পড়িয়া আছে। ইতিহাসে এই ঘটনাকে অন্ধকূপ হত্যা বলে (১৭৫৬ খৃঃ অঃ)।* এই নিদারুণ সংবাদ যখন মান্দ্রাজে পৌঁছিল, তখন ইংরেজেরা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিলেন। ক্লাইব এবং ওয়াট্‌সন সাহেবের অধীনে কোম্পানি বাহাদুর বাঙ্গালায় সৈন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা

* বর্ত্তমান সময়ে অন্ধকূপ হত্যার ঘটনা ঐতিহাসিক সত্য কি না সে সম্বন্ধে অনেক গুরুতর প্রশ্ন উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু আজও তাহার কোন মীমাংসা হয় নাই।

আসিয়াই কলিকাতা কাড়িয়া লইলেন। হুগলি আক্রমণ করিলেন। ইউরোপে এই সময় ইংরেজ ফরাসীতে যুদ্ধ চলিতেছিল। অতএব ক্লাইব ভাবিলেন, চন্দননগর আগেই দখল করা ভাল। তাই চন্দননগর আক্রমণ করিলেন। অতুল বীরত্বের সহিত ফরাসীরা নগর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিল; কিন্তু পারিল না। ক্লাইব গোপনে সিরাজের সেনাপতি মীরজাফরের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। মীরজাফর যদি সিরাজের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ না করেন, তবে ইংরেজেরা তাঁহাকে বাঙ্গালার নবাব করিবেন, এই স্থির হইল। ইংরেজদিগের দলে কেবল তিন হাজার সৈন্য ছিল এবং নবাবের ৩৮ হাজার সৈন্য ছিল। ইংরেজেরা যুদ্ধের পূর্ব্বে মন্ত্রণা করিলেন যে, এত অল্প সৈন্য লইয়া, হঠাৎ যুদ্ধ করা উচিত নয়। ক্লাইবও তখন সেই মতে মত দিলেন। কিন্তু সভা ভঙ্গ হইলে, রাত্রে তিনি নির্জ্জনে ভাবিতে লাগিলেন; এবং অবিলম্বে যুদ্ধ করাই উচিত বুঝিলেন। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র তিনি নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য চলিলেন। পলাসীর মাঠে আমবাগানের ভিতর তাঁহার সৈন্যগণ উপস্থিত হইল। নবাব নিকটে ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরজাফর, রায় দুর্লভ প্রভৃতি সিরাজের সেনাপতিগণ ইংরেজদিগের সহিত পূর্ব্বের পরামর্শমত যুদ্ধ না করিয়া কেবলমাত্র দাঁড়াইয়াছিলেন। কেবলমীরমদন এবং মোহনলাল নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মীরমদন যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িলেন। মীরজাফরের চক্রান্তে নবাবের বিপুল আয়োজন বিফল হইল। তখন নাম মাত্র যুদ্ধ করিয়া, যে যেমনে পারিল পলাইল। নবাবও পলায়ন করিলেন। এই প্রকারে বলিতে গেলে, বিনা যুদ্ধে ক্লাইব পলাসীর ক্ষেত্রে জয়ী হইলেন (১৭৫৭ খৃঃ অঃ)। পলাসীর যুদ্ধের পর ফলতঃ ইংরেজেরাই বাঙ্গালার রাজা হইলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহারা রাজসিংহাসন অধিকার না করিয়া,সমুদায় ক্ষমতা আপনাদিগের হস্তে রাখিয়া পূর্ব্বের পরামর্শ মত মীরজাফরকে বাঙ্গালার

"সাক্ষী গোপাল" নবাব করিলেন। মীরজাফর নবাবের গদীতে বসিলেন। ওদিকে সিরাজউদ্দৌলা প্রাণ লইয়া পলাইলেন। কিন্তু প্রাণ বাঁচাইতে পারিলেন না। পথে একজন ফকিরের গৃহে অতিথি হইলেন; সে সিরাজকে বন্দী করিয়া, মুরশিদাবাদে সংবাদ পাঠাইল। নূতন নবাবের লোকেরা আসিয়া সিরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। মীরজাফরের পুত্র মীরণ অতি নিষ্ঠুরভাবে সিরাজকে হত্যা করিলেন। যাহা হউক মীজাফরের অদৃষ্টে রাজত্ব-ভোগ বেশী দিন হইল না। শীঘ্রই ইংরেজেরা তাঁহার মুকুট কাড়িয়া লইয়া, তাঁহার জামাতা মীরকাশিমের মস্তকে পরাইলেন। মীরজাফরকে নবাব করিয়া ইংরেজেরা বিস্তর ধন লইয়াছিলেন—

নৌসেনা ও পদাতিকদিগের জন্য--	৫৩ লক্ষ
কৌন্সিলের প্রত্যেক মেম্বরের জন্য—	২॥০ „
ক্লাইবের জন্য—	২৩ „

ইহা ভিন্ন ৮০ লক্ষ টাকা নৌকায় করিয়া মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিল। এই প্রকারে নবাবের ধনাগার শূন্য হইয়া গেল।

মীরকাশিম—মীরজাফর বৃদ্ধ এবং অতিশয় অকর্ম্মণ্য ছিলেন। সুতরাং ইংরেজেরা সহজেই তাঁহাকে হাতের পুতুল করিতে পারিয়াছিলেন এবং অবাধে তাঁহার মস্তক হইতে মুকুট কাড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু মীরকাশিম সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না; সুতরাং ইংরেজদিগের সহিত শীঘ্রই তাঁহার বিবাদ বাধিয়া গেল। রাজ্যশাসন বিষয়ে মীরকাশিম অতি সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজেরা সে সম্বন্ধে তাঁহার খুঁত ধরিতে পারেন নাই। তোমাদের হয় ত মনে আছে যে, বহুকাল পূর্ব্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাটের নিকট হইতে বিনা মাশুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। এখন সেই দাবী করিয়া, শুধু কোম্পানি নয় কোম্পানির ভৃত্যেরা পর্য্যন্ত বিনা

মাশুলে বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অথচ দেশীয় বণিকদিগের মাশুল দিতে হইত। ইহাতে দেশের বাণিজ্যের বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল এবং ইংরেজদিগের নিকট মাশুল না পাওয়াতে রাজ্যের রাজস্ব কমিয়া গেল। মীরকাশিম কোম্পানির ভৃত্যদিগের এই অন্যায় ব্যবহারের কথা কলিকাতার বড় সাহেবদিগকে জানাইলেন। কিন্তু কেহ তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না; তখন তিনি বিরক্ত হইয়া, দেশী বিদেশী সকলের নিকট হইতেই বাণিজ্যের মাশুল লইতে ক্ষান্ত হইলেন। এই কারণে মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদিগের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। নবাবসৈন্য পাটনা ও কাশিমবাজার দখল করিল এবং তথায় যত ইংরেজ ছিল তাহাদিগকে হত্যা করিল।

মীরকাশিম দুই বৎসর মাত্র নবাব ছিলেন এবং সেই অল্প সময়ের মধ্যে সৈন্যদিগকে এমন সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন যে, ইংরেজেরা বিনা ক্লেশে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ঘেরিয়া আর উধানালা নামক স্থানে দুই যুদ্ধ হয়, তাহাতে মীরকাশিম পরাজিত হইয়া অযোধ্যায় পলায়ন করেন (১৭৬৩ খৃঃ অঃ)। মীরকাশিমের হইয়া অযোধ্যার নবাব ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন, কিন্তু বকসারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করেন।

মীরকাশিমের পর ইংরেজেরা আবার মীরজাফরকে নবাব করিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র নামমাত্র নবাব হইলেন। লর্ডক্লাইব দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার লইলেন এবং তাহার পরিবর্ত্তে সম্রাটকে কোরা ও এলাহাবাদ দিলেন এবং বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা রাজকর দিতে স্বীকৃত হইলেন। নবাবকে বৎসরে ৫০ লক্ষ টাকা দিয়া, বাকি সমস্তই ইংরেজ কোম্পানি পাইবেন, এইরূপ স্থির হইল (১৭৬৫ খৃঃ অঃ)।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ ও ফরাসী—যখন ইংরেজেরা বাঙ্গালা দেশে এই সকল তুমুল প্রলয় ঘটাইতেছিলেন, তখন দাক্ষিণাত্যে ফরাসীরা ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে মহা আস্ফালন করিতেছিলেন। ডুপ্লের সময়ে ত দাক্ষিণাত্যে ফরাসীরা সর্ব্বেসর্ব্বাই ছিলেন। তখনও লালী ও বুসীর প্রতাপে দাক্ষিণাত্যে ফরাসীদিগের প্রতাপ বড় সামান্য ছিল না। এই সময়ে লালী ফরাসী গভর্ণর ছিলেন, আর বুসী নিজামের অধীন উত্তর সরকারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বুসী অতিশয় বুদ্ধিমান, এবং ক্ষমতাশালী ছিলেন। লালীর আজ্ঞা মত বুসী নিজামের রাজ্য ছাড়িয়া পণ্ডিচেরীতে আসিলেন, সেই সঙ্গে সেই অঞ্চলে ফরাসীদিগের প্রভুত্ব চলিয়া গেল। এই সময় ইউরোপে ফরাসী ও ইংরেজদিগের ভিতর বিবাদ চলিতেছিল। সেই জন্য ফরাসীরা মান্দ্রাজ আক্রমণ করিয়া জয় করিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা ত্বরায় আপনাদের হৃত অধিকার ফরাসীদিগের নিকট হইতে কাড়িয়া লইলেন। অবশেষে যুদ্ধে লালীকে পরাজিত করিয়া পণ্ডিচেরী অধিকার করিলেন এবং সেখানকার কেল্লা ভাঙ্গিয়া ভুমিসাৎ করিলেন। ফ্রান্সের লোকেরা ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের হস্তে ফরাসীদিগের এই লাঞ্ছনার কথা শুনিয়া, একেবারে চটিয়া গেল। এমন কি তাহাদের ক্রোধের শান্তির জন্য লালীর প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইল। কিন্তু বাস্তবিক লালীর কোন দোষ ছিল না। তিনি স্বদেশকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন। সেই সময় হইতে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী জাতির প্রভুত্ব একেবারে ঘুচিয়া গেল। দুদিন পূর্ব্বে যে ফরাসী নাম দাক্ষিণাত্যে গৌরবান্বিত ছিল আজ তাহা হঠাৎ নিবিয়া গেল। সন্ধি হইলে ফরাসীরা ইংরেজদিগের নিকট হইতে কেবল পণ্ডিচেরী ফিরিয়া পাইলেন।

নিজাম ও ইংরেজ—আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বুসী নিজামের অধীন উত্তরসরকারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বুসী দেশ হইতে

লর্ড ক্লাইব কর্তৃক বাঙ্গলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ।

চলিয়া আসিলে, ইংরেজেরা তাহা গ্রাস করেন। ইহাতে নিজাম অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ইংরেজদিগের নিকট হইতে রাজ্যটী কাড়িয়া লইবার জন্য যুদ্ধের বিপুল আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার আয়োজনের ঘটা দেখিয়া, ইংরেজেরা কিছু ভয় পাইলেন এবং ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া, রাজ্যটী হস্তে রাখিলেন (১৭৬৬ খৃ. অ.)।

মহীসুরের হায়দর আলী বহুকাল হইতে মহীসুর হিন্দু-রাজার অধীন ছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন হায়দর

মহীসুরের হায়দর আলী।

আলী নামে একজন মুসলমান তথাকার নাবালক হিন্দু রাজাকে নানা কৌশলে বঞ্চিত করিয়া, স্বয়ং মহীসুরের রাজা হইয়াছিলেন। হায়দর আলী পূর্ব্বে ফরাসীদিগের অধীনে সামান্য একজন সৈনিক ছিলেন সেই সময়ে তিনি ইউরোপীয়দিগের মত যুদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলেন

হায়দর অতিশয় চতুর ছিলেন, প্রথমে তিনি মহীসুরের হিন্দু রাজার অধীনে সেনাপতির কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন ; তখন মহীসুরের সিংহাসনে নাবালক রাজা ছিলেন। সেই নাবালককে বঞ্চিত করিয়া, তাঁহার পিতৃব্য স্বয়ং রাজা হইবার চেষ্টা করেন। সেই সময় হায়দর সেই বালকের পক্ষ হইয়া, তাহার পিতৃব্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে পরাজিত করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে সেই বালককে বঞ্চিত করিয়া হায়দর স্বয়ং মহীসুরের রাজা হইলেন (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ)।

সেই সময়ে ভারতবর্ষের চারিদিকেই ঘোর অরাজকতা চলিতেছিল। "জোর যার মুল্লুক তার" এই কথাই যেন ভারতময় প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। চারিদিকে ডাকাতি, চারি দিকে অত্যাচার ! এমন কোন শক্তি ছিল না, যে এ সকল অরাজকতা দমন করিতে পারে। হায়দর রাজা হইলে, তাঁহার ক্ষমতা দোর্দ্দিণ্ড হইল। তিনি ফরাসীদিগের অধীনে এক সময়ে সৈনিক ছিলেন, তাই রাজা হইয়াও তাহাদিগের সহিত বন্ধুতা করিতে লাগিলেন। কাজেই ইংরেজদিগের বিষ নয়নে পড়িলেন।

নিজাম এবং ইংরেজ উভয়ে মিলিয়া, হায়দরের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। যুদ্ধে হায়দর পরাজিত হন (১৭৬৭খৃঃ অঃ। কিন্তু নিজাম অন্তরে ইংরেজদিগের বন্ধু ছিলেন না, বরং শত্রুই ছিলেন ; তাই বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিলেন। ইংরেজেরাও নিজামের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে নিজাম একেবারে পরাজিত হইলেন। হায়দরও ওদিকে পরাজিত হইয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। এবং লুকাইয়া বিস্তর সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করিয়া মান্দ্রাজ আক্রমণ করিতে গেলেন। ইংরেজেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ত্রস্ত হইয়া অগত্যা হায়দরের মনোমত সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সন্ধি সূত্রে যে যাহার অধিকার ফিরিয়া পাইলেন। ভবিষ্যতে হায়দর ও ইংরেজ পরস্পরের সহায় হইবেন, এইরূপ স্থির হইল (১৭৬৯খৃঃ।

সুকুমারমতি পাঠক পাঠিকাগণ, ভারতবর্ষের এই সময়কার ইতিহাস বড় জটিল। এখন কেবল পরিবর্ত্তন। পুরাতন গিয়া নূতন রাজ্য সকল ভারতের চারিদিকে হইতেছিল। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে মারাঠারা প্রবল শক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূর্ব্বকূলে ইংরেজেরা মস্তক তুলিয়া উঠিতেছিলেন। মধ্যে নিজাম ও হায়দর আলি। দেখ এ সকল নূতন শক্তি। উত্তর-ভারতবর্ষের দিকে চাহিয়া দেখ, পঞ্জাবে শিখদিগের তখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। গুজরাটে, মধ্য-ভারতবর্ষে মারাঠারা সর্ব্বেসর্ব্বা। দিল্লীর সম্রাট তখন কেবল নামমাত্র ছিলেন, তা তিনি ও মারাঠাদিগের হস্তে। অযোধ্যায় নূতন মুসলমান রাজা। রোহিলখণ্ডে রোহিলারাও এক নূতন শক্তি। বাঙ্গালা বিহারের পুরাতন মুসলমান রাজ্য অস্তপ্রায়; সেখানে ইংরেজদিগের বিজয় রবি দিক্ উজ্জ্বল করিয়া উঠিতেছিল। কিরূপে ইংরেজেরা অল্পকালের মধ্যে এই সকল শক্তিকে পরাজিত করিয়া, সমুদায় ভারতের একমাত্র রাজাধিরাজ অধীশ্বর হইলেন তাহার বিবরণ শ্রবণ কর

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কোম্পানীর রাজত্ব।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনস্থ গবর্ণর এবং গবর্ণর জেনারেলদিগের নামের তালিকা।

১৭৫৮ লর্ড ক্লাইব	১৮১৩ আর্ল্ অব ময়রা
১৭৬৭ হেরিবর্ণ ষ্ট	১৮২৩ জন আডাম
১৭৬৯ জন কাটিয়ার	১৮২৩ লর্ড আমহার্ষ্ট
১৭৭৪ ওয়ারেন হেষ্টিংস	১৮২৮ লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক
১৭৮৫ সারজন মেকফার্সন	১৮৩৫ সার চার্লস্ মেটকাফ্
১৭৮৬ মারকুইস অব কর্ণওয়ালিস্	১৮৩৬ আরল অব অকল্যাণ্ড
১৭৯৩ সারজন সোর	১৮৪২ আরল অব এলেনবরা
১৭৯৮ মারকুইস অব ওয়েলসলি	১৮৪৪ ভাইকাউণ্ট হার্ডিঞ্জ
১৮০৫ সার জর্জ বার্লো	১৮৪৮ লর্ড ডালহৌসি
১৮০৭ আরল্ অব মিণ্টো	

ওয়ারেন হেষ্টিংস—(১৭৭২-৮৫ খৃঃ অঃ) ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর হইবার ঠিক পূর্ব্বে (১৭৭১ খৃঃ অঃ) বাঙ্গালা দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। আজ পর্য্যন্ত আমাদের দেশের লোকে সে দুর্ভিক্ষের কথা ভুলিতে পারে নাই। "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" বলিয়া সেই বিষম সময়ের কথা স্মরণ

করে। সেই ভয়ানক দুর্ভিক্ষের পরই হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়া আসিলেন। ক্লাইবের মত হেষ্টিংসের নামও ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। হেষ্টিংস এদেশের লোকের নিকট কিরূপ পরিচিত ছিলেন, তাহা এই হিন্দি প্রবাদটী শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।

হাতি পর হাওদা ঘোড়া পর জিন
জল্‌দি আও জলদি আও সাহেব হেষ্টিং।

সাহেব হেষ্টিংস্ বড় সামান্য লোক ছিলেন না। অনেক বিষয়ে তিনি ক্লাইবের সমান ছিলেন। দুই জনেই অল্প বয়সে কোম্পানীর কাজে এদেশে আসেন। দুই জনেই কার্য্যদক্ষ এবং বুদ্ধিমান ছিলেন। অনেক দিন এদেশে বাস করাতে, দুই জনেরই এদেশ সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল। হেষ্টিংস এদেশের ভাষা পর্য্যন্ত শিখিয়াছিলেন। তিনি হিন্দি ও পার্সী জানিতেন। ক্লাইব বাঙ্গালায় ইংরেজ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। হেষ্টিংস এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন। সে সময়ে এদেশে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, চারিদিকে অরাজকতা ছিল।

বাঙ্গালার সাক্ষীগোপাল মুসলমান নবাব তখন পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতেছিলেন। ক্লাইব মুসলমান নবাবের হস্তে বাঙ্গালাদেশের শাসনের ভার অর্থাৎ আদালত রাখিয়াছিলেন এবং ইংরেজ কোম্পানির উপর এদেশের কর আদায়ের ভার ছিল। হেষ্টিংস্ দেখিলেন, নবাবের হস্তে আদালতের ভার দেওয়া বৃথা, সুবিচার কিছুই হয় না, কাজেই তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে আদালত উঠাইয়া কলিকাতায় আনিলেন। যাহাতে সুবিচার হয়, সেই জন্য ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালত প্রতিষ্ঠা করিলেন। আপিল শুনিবার জন্য কলিকাতায় সদর দেওয়ানী এবং সদর নিজামত নামে দুইটি আদালত হয়। তখন হইতে কলিকাতা বাঙ্গালা বিহারের রাজধানী হইল। ক্লাইব নবাবের যে বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন হেষ্টিংস তাহা কমাইয়া দিলেন। ক্লাইব দিল্লীর বাদ

সাহকে এলাহাবাদ এবং কোরা প্রদেশ ও বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, হেষ্টিংস তাহা একেবারে বন্ধকরিয়া দিলেন এবং ৪০ লক্ষ টাকায় এলাহাবাদ ও কোরা অযোধ্যার উজীরকে বিক্রয় করিলেন। দিল্লীর সম্রাট সা আলম্ সেই সময়ে মারাঠাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করাতে ইংরেজকোম্পানী তাঁহাকে কিছুই দিতে চাহিলেন না। অযোধ্যার উজীরের সহিত এই সময় রোহিলাদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদের কারণ এই যে, মারাঠারা রোহিলখণ্ড অক্রমণ করিলে রোহিলা সর্দার ৪০ লক্ষ টাকা দিবার অঙ্গীকার করিয়া, অযোধ্যার নবাবের সাহায্য প্রার্থনা করেন। নবাব উজীর ইহাতে সম্মত হন। কিন্তু যুদ্ধ উপস্থিত না হইতেই মারাঠারা আপন হইতে রোহিলখণ্ড ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। সুতরাং রোহিলা সর্দার অযোধ্যার নবাবকে কিছু দিতে চাহিলেন না। নবাব উজীর তাহা শুনিলেন না। তিনি রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হেষ্টিংসের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কোম্পানির অর্থাগমের আশায় হেষ্টিংস সাহায্যদানে সম্মত হইলেন। রোহিলারা আফগান বীর, তাহারা বীরের মত প্রাণ দিল। শস্যপূর্ণ সুন্দর রোহিলা-প্রদেশ মরুভূমি হইল।

কাশির নবাব চৈৎসিংহ পূর্ব্বে অযোধ্যার নবাবের করদ ছিলেন। কিন্তু নবাব সুজা উদ্দৌলার মৃত্যুর পর ইংরেজদিগের করদ হন। তিনি বৎসরে ২০ লক্ষ টাকা কর দিতেন। হেষ্টিংস্ আরও কর বাড়াইলেন। চৈৎ সিংহ বলিলেন, তিনি আর কর দিতে কোন প্রকারেই পারেন না। হেষ্টিংস শুনিলেন না। তাহার উপর আবার ২৫ লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন। চৈৎ সিংহ বিদ্রোহী হইলেন। হেষ্টিংস কাশিতেই ছিলেন, তিনি এই দুর্যোগ দেখিয়া চুনারে পলায়ন করিলেন। হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া চৈৎসিংহ মালবে পলাইলেন। হেষ্টিংস তাঁহার সর্ব্বস্ব অধিকার করিলেন

ওয়ারেন হেষ্টিংস

এবং কর দ্বিগুণ বাড়াইয়া চৈৎসিংহের এক জন ভাগিনেয়কে রাজা করিলেন।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হইলেন। অযোধ্যার নবাব ইংরেজদিগকে রোহিলা যুদ্ধের সাহায্যের জন্য যে অর্থ দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা এত দিন দিতে পারেন নাই, এবং আসফউদ্দৌলার সময় সেই ঋণ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। হেষ্টিংস তাহাকে ঋণ শোধ করিবার জন্য বার বার বলেন। আসফ বলিলেন, তাহার হস্তে আর অর্থ নাই, তবে পূর্ব্বের নবাবের বেগমদিগের নিকট বিস্তর ধন আছে, হেষ্টিংস যদি তাহা আদায় করিয়া দেন, তাহা হইলে ঋণ তৎক্ষণাৎ পরিশোধ হয়। হেষ্টিংস নবাবকে বেগমদিগের সম্পত্তি অধিকার করিতে অনুমতি দিলেন। ইংরেজ সৈন্যের সহায়তায় নবাব বেগমদিগের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইলেন। হেষ্টিংস বিলাতে ফিরিলে, এই সকল কার্য্যের জন্য সাত বৎসর ধরিয়া পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় তাঁহার বিচার হয়। তাহাতে তিনি ধন মান সর্ব্বস্ব হারাইলেন। অবশেষে তিনি নির্দ্দোষী ইহা প্রমাণ হইল বটে, কিন্তু সাত বৎসর মকদ্দমা চালাইয়া তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হেষ্টিংস যতদিন বাঁচিয়াছিলেন, কোম্পানির কর্তৃপক্ষগণ তাহাকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

মহারাজ নন্দকুমার—হেষ্টিংসের সময় কলিকাতায় আর এক ঘটনা ঘটে, তাহাতে কলিকাতার হিন্দু সমাজে মহা হুলস্থুল পড়িয়া যায়। হেষ্টিংসের সময় গভর্ণর জেনারলের এক কৌন্সিল অর্থাৎ সভা ছিল, বিলাত হইতে ইহার মেম্বর নিযুক্ত হইয়া আসিতেন। যদিও গভর্ণর সভাপতি ছিলেন, তথাপি এই মেম্বরদিগের বিস্তর ক্ষমতা ছিল। হেষ্টিংসের সময় ফিলিপ ফ্রান্সিস নামে এই সভার এক জন প্রধান মেম্বর ছিলেন। তিনি হেষ্টিংসের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং

প্রত্যেক কাজেই তাঁহাকে বাধা দিতেন। এই কারণে পরস্পরের মধ্যে ঘোর শত্রুতা জন্মে, এমন কি এক সময়ে তাঁহাদিগের ভিতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ পর্য্যন্ত হইয়াছিল। কৌন্সিলের সহিত হেষ্টিংসের এই শত্রুতার সুযোগ লইয়া, কলিকাতার একজন ধনী বাঙ্গালী মহারাজা নন্দকুমার হেষ্টিংসের নামে এই অভিযোগ করেন যে, তিনি ঘুষ লইয়া, তাহার পুত্র গুরুদাসকে নবাবের অধীনে চাকরি করিয়া দিয়াছেন। কৌন্সিলের মেম্বরগণ এ'কথার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে হেষ্টিংসকে অনুরোধ করিলে, তিনি ঘৃণাপূর্ব্বক তাহা অস্বীকার করিলেন। ওদিকে একজন মুসলমান নন্দকুমারের নামে সুপ্রিম-কোর্টে জালের মকদ্দমা উপস্থিত করেন। বিচারে নন্দকুমার দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাঁহার ফাঁসি হয়; এই ঘটনায় হিন্দুরা স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালাদেশে হেষ্টিংস যখন এই সকল ব্যাপার করিয়াছিলেন, তখন বম্বে ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে মহাকাণ্ড উপস্থিত হইতেছিল। পুণার মারাঠাগণ বিবাদ করিয়া বম্বের ইংরেজদিগের সাহায্য ভিক্ষা করেন। বম্বের গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে গিয়া প্রথম মারাঠা যুদ্ধে লিপ্ত হন। সন্ধি হইলে বম্বে গভর্ণমেণ্ট সালসিটি ও এলিফেণ্টা লাভ করিলেন।

ওদিকে মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইংরেজদিগের ঘোর বিপদ উপস্থিত হইল। মান্দ্রাজ কর্ত্তৃপক্ষদিগের বিসদৃশ ব্যবহারে মহীসুরের হায়দর-আলী ও হায়দরাবাদের নিজাম ইংরেজদিগের ঘোর শত্রু হইয়া উঠি-লেন। এবং মারাঠাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজদিগকে সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। সেই সময় হেষ্টিং-সের মত বিচক্ষণ লোক গভর্ণর না থাকিলে, ইংরেজদিগের পরিণাম যে কি হইত, তাহার ঠিক নাই। হেষ্টিংস কৌশল করিয়া নিজাম আর নাগপুরের মারাঠারাজকে বশীভূত করিলেন; কিন্তু হায়দার আলী

তাঁহাদিগকে যার পর নাই ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। হায়দার আলী এমন তেজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন যে, ইংরেজ সেনারা অস্থির হইয়া উঠিল। প্রথমে ইংরেজেরা পালিনোরের যুদ্ধে পরাজিত হন, কিন্তু শেষে ইংরেজদিগের ভাগ্য ফিরিল, এবং পোর্টনভো ও সোলিমগড়ের যুদ্ধে হায়দর পরাজিত হইলেন। হায়দরের মৃত্যুতে তাহার পুত্র টিপুর সহিত সন্ধি হইল। (১৭৮৩ খৃঃ অঃ)। বম্বে এবং মান্দ্রাজে ইংরেজদিগকে এই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া হেষ্টিংস দেশে ফিরিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস—(১৭৮৬—৯৩ খৃঃ অঃ) লর্ড কর্ণওয়ালিস একজন উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি বাঙ্গালার জমিদারী সম্বন্ধে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই যে, জমিদারেরা নির্দ্দিষ্ট বার্ষিক কর দিবেন এবং ভবিষ্যতে ভূমির কর আর বাড়িবে না। ইহাতে বাঙ্গালাদেশের বড়ই মঙ্গল হইয়াছে।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় টিপু সুলতানের সহিত আবার ইংরেজদিগের যুদ্ধ হয়। ত্রিবাঙ্কুরের রাজা ইংরেজদিগের করদ ছিলেন। টিপু তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করাতে, তৃতীয় মহীসুর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজদিগের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। যুদ্ধে টিপু পরাজিত হন এবং অর্দ্ধেক রাজ্য ও তিন লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি করেন (১৭৯২ খৃঃ অঃ)। রাজ্য এবং টাকা নিজাম, মারাঠা ও ইংরেজ কোম্পানি সমান ভাগ করিয়া লইলেন।

মার্কুইস অব ওয়েলেসলি— ১৭৯৮—১৮০৫ খৃঃ অঃ ইহার শাসন সময়ে চতুর্থবার মহীসুরে যুদ্ধ হয়। ফরাসীদিগের সহিত টিপুর বন্ধুতাই এই যুদ্ধের কারণ। ইংরেজ ফরাসীতে চিরদিনই শত্রুতা। এই সময় আবার ফরাসী বীর নেপোলিয়ানের সহিত ইংরেজদিগের তুমুল যুদ্ধ চলিতেছিল। নেপোলিয়ান মিসরে ছিলেন, পাছে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, এই ভয়ে ইংরেজ কোম্পানি তখন শঙ্কিত ছিলেন।

এরূপ অবস্থায় টিপুর ফরাসীদিগের সহিত বন্ধুতা ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বড় ভয়ের কারণ হইল। ওয়েলেসলি টিপুকে নিজামের ন্যায় ইংরেজ কোম্পানির সহিত পরস্পর সহায়তা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে বলিলেন। তাহাতে টিপু অস্বীকার করেন। তখন টিপুর সহিত যুদ্ধ করাই স্থির হইল। টিপু বীরের মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেই সঙ্গে মহীসুরের মুসলমান রাজবংশ লোপ পাইল।

ওয়েলেসলী পুরাতন হিন্দু রাজবংশের একজনকে রাজা করিলেন। টিপুর পুত্রেরা ইংরেজ কোম্পানির বৃত্তিভোগী হইয়া প্রথমে বিলোরে শেষে কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। যুদ্ধের পর মহীসুর রাজ্যের অধিকাংশ নিজাম, ইংরেজ ও মারাঠারা ভাগ করিয়া লইলেন। এখন মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির সীমা যতদূর, তখন মান্দ্রাজ অঞ্চলে ইংরেজ রাজ্য ততদূর বিস্তৃত হইল। ওয়েলেসলী টিপুকে বিনাশ করিলেন। নিজামকে বশীভূত করিলেন, এখন যাহাতে দুর্দান্ত মারাঠাদিগকে জব্দ করিতে পারেন, সেই চেষ্টায় রহিলেন এবং শীঘ্রই তিনি সে সুযোগ পাইলেন।

তোমাদের হয়ত পাঁচটী মারাঠা রাজ্যের কথা মনে আছে ঃ—(১) পুনার পেশওয়া (২) গুজরাটের গাইকোয়াড (৩) সিন্ধিয়া (৪) হোলকার (৫) নাগপুরের ভোঁসলে। ওয়েলেসলীর সময় দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ কোম্পানি পেশওয়ার হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। অন্য সকল মারাঠা রাজারা ইহাদের বিরোধী পক্ষ ছিলেন। স্বয়ং গবর্ণর জেনারেল এবং তাঁহার ভ্রাতা এই যুদ্ধের নেতা ছিলেন, আসাই আর্গাম, আলিগড, লাসোয়ারি প্রভৃতি স্থানে মারাঠারা পরাজিত হইল। গাইকোয়াড, ভোঁসলে ও সিন্ধিয়া ইংরেজদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। কেবল হোলকার বশীভূত হইলেন না। পরে সিন্ধিয়াও আবার হোলকারের সহিত যোগ দিলেন।

ওয়েলেসলী এই সকল যুদ্ধ করিয়া, ইংরেজ কোম্পানির রাজ্যের

সীমা অনেক বাড়াইলেন বটে, কিন্তু বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষেরা এইরূপ রাজ্য-বৃদ্ধির একান্ত বিরোধী ছিলেন; তাঁহারা ওয়েলেসলীর ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া লইলেন।

লর্ড ময়রা বা মার্কুইস অব্ হেষ্টিংস—(১৮১৩ ২৩খৃঃঅঃ) লর্ড ময়রা ৯ বৎসর গভর্ণর জেনারেল ছিলেন, তাহার সময়ে ইংরেজ কোম্পানির বিস্তর রাজ্য বৃদ্ধি হইয়াছিল। তাহার শাসনকালে দুইটী প্রধান যুদ্ধ হয়। (১) নেপালের গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধ। (২) মারাঠা-দিগের সহিত শেষ যুদ্ধ।

নেপাল যুদ্ধ,—গুর্খারা নেপালের বীর পার্ব্বত্যজাতি। ইহা-দিগের অত্যাচারে চারিদিকের লোকেরা সর্ব্বদাই ভয়ে ভয়ে বাস করিত। ক্রমে তাহারা পর্ব্বত হইতে নামিয়া গঙ্গা নদীর উপকূলে উপদ্রব আরম্ভ করিল; ইংরেজ রাজ্য আক্রমণ করাতে পূর্ব্বের গভর্ণরেরা তাহাদিগকে বার বার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহারা পূর্ব্ববৎ ইংরেজ রাজ্যে উপদ্রব করিতে লাগিল। তখন অগত্যা গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির হইল। প্রথম প্রথম ইংরেজেরা কিছুই করিতে পারিলেন না। একে গুর্খারা মহাবীর তাহাতে দুর্গম পর্ব্বত তাহাদের সহায়; ইংরেজ সৈন্য সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল অক্টারলনি তাহাদিগের পার্ব্বত্য দুর্গ সকল একে একে জয় করিলেন। তখন নেপাল-রাজ সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন এবং নৈনিতাল, মসুরি ও সিমলা ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন হইতে এই সকল স্থান ইংরেজদিগের আরামের বাসস্থান হইয়াছে।

পিণ্ডারী যুদ্ধ,—উত্তরে হিমালয়ে যখন গুর্খাদিগের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন মধ্য ভারতবর্ষে পিণ্ডারী নামে একদল ডাকাত ইংরেজ অধিকারে মহা উৎপাত করিতেছিল। এই ভয়ানক দস্যুরা দলে দলে, এমন কি শত সহস্র জন মিলিত হইয়া গ্রামে গ্রামে পড়িয়া

লোকদিগকে ধনে প্রাণে সারা করিত। পিণ্ডারী সর্দ্দারগণের সহিত মারাঠারাজাদিগের ভিতরে ভিতরে সদ্ভাব ছিল। সেই জন্য ইংরেজ কোম্পানি এত দিন পিণ্ডারীদিগকে বিনাশ করিতে পারেন নাই। এক্ষণে ইহাদের দৌরাত্ম্য অসহ্য হওয়াতে, লর্ড ময়রা ইহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিতে সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রকাণ্ড দুই দল সৈন্য প্রস্তুত করিয়া, উত্তর এবং দক্ষিণদিক হইতে ক্রমশঃ আসিয়া, মধ্য-ভারতে পিণ্ডারীদিগের আবাসস্থান বেষ্টন করিয়া, দুর্দ্দান্ত দস্যুদিগকে দলে দলে বিনাশ করিতে লাগিলেন (১৮১৭ খৃঃ অঃ)। তখন অসহায় হইয়া করিম, আমীর খাঁ প্রভৃতি পিণ্ডারী সর্দ্দারগণ ইংরেজদিগের পদানত হইল। পিণ্ডারীদিগের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে মধ্য-ভারতবর্ষ ইংরেজদিগের হস্তে পড়িল। পিণ্ডারী দস্যুগণের বিনাশে দেশের লোকেরা শান্তিলাভ করিল।

শেষ মারাঠা যুদ্ধ—দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধের পর পুণায় এক জন ইংরেজ রেসিডেন্ট অবস্থিতি করিতেছিলেন। পেশওয়া বিদ্রোহী হইয়া হঠাৎ তাঁহাকে হত্যা করেন। এই কারণে শেষ মারাঠা যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে একে একে সকল মারাঠারাজগণই ইংরেজদিগের বিদ্রোহী হইলেন। ইংরেজ সৈন্য একে একে সকলকেই পরাজিত করিল। পেশওয়াকে পরাস্ত করিয়া ইংরেজ কোম্পানি তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইলেন। তখন হইতে পেশওয়া নাম উঠিয়া গেল। পেশওয়া বাজীরাও ৮ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি পাইয়া, কাণপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। পেশওয়ার রাজ্য লইয়াই এখনকার বম্বে প্রেসিডেন্সি হইয়াছে। সেতারায় শিবাজীর বংশের এক জনকে ইংরেজেরা নাম মাত্র পেশওয়ার পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নাগপুরেও একজন বালককে ইংরেজেরা রাজপদ দিলেন, এবং

একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট সেখানে থাকিয়া, সকল রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। হোলকারের রাজপদেও একজন বালক প্রতিষ্ঠিত হইল; সেখানেও ইংরেজেরা সকল প্রকার কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। মারাঠাদিগের সহিত ইংরেজদিগের এই শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পর মারাঠাদিগের প্রতাপ চিরদিনের মত লোপ পাইয়াছে। রাজপুতনার যত রাজা এই যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানির আশ্রিত হইলেন।

লর্ড আমহার্ষ্ট—(১৮২৩-২৮ খৃঃ অঃ) ইঁহার শাসন সময় মগদিগের সহিত ইংরেজদিগের প্রথম যুদ্ধ হয়। মগরাজ আরাকাণবাসীদিগের উপর ঘোরতর অত্যাচার করেন। যদিও তাহারা তাঁহার প্রজা ছিল, কিন্তু অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, ইংরেজ রাজ্যে আসিয়া আশ্রয় লইল। মগরাজ এই সকল পলাতকদিগকে তাঁহার হস্তে দিবার জন্য ইংরেজ গবর্ণরকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ইংরেজেরা শরণাগতদিগকে পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। ইহাতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। মগ সেনাপতি কাছাড় ও আসাম জয় করিয়া, ব্রিটিশ অধিকারে প্রবেশ করিল। ইংরেজেরা ওদিকে সমুদ্র পার হইয়া, রেঙ্গুণ আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে ইংরেজেরা জয়ী হইলেন। সন্ধি হইলে মগরাজ ইংরেজ কোম্পানিকে যুদ্ধের ব্যয় এক কোটি টাকা দিলেন এবং আসাম আরাকান ও টেনাসিরিম ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন হইতে এই সকল স্থান ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে (১৮২৬ খৃঃ অঃ)।

ভরতপুর অধিকার—জাঠরাজ বলবন্ত সিংহকে হত্যা করিয়া তাঁহার পিতৃব্যপুত্র দুর্জ্জনশাল ভরতপুরের রাজা হইলেন। ইংরেজ কোম্পানি পূর্ব্বের জাঠরাজের সহিত মিত্রতার অনুরোধে দুর্জ্জনশালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এবং দুর্জ্জয় ভরতপুরের কেল্লা ইংরেজেরা দখল করিলেন (১৮২৭ খৃঃ অঃ) এবং তখন হইতে ভরতপুরের রাজা ইংরেজদিগের অধীন হইলেন।

ভবতপুব দুর্গ।
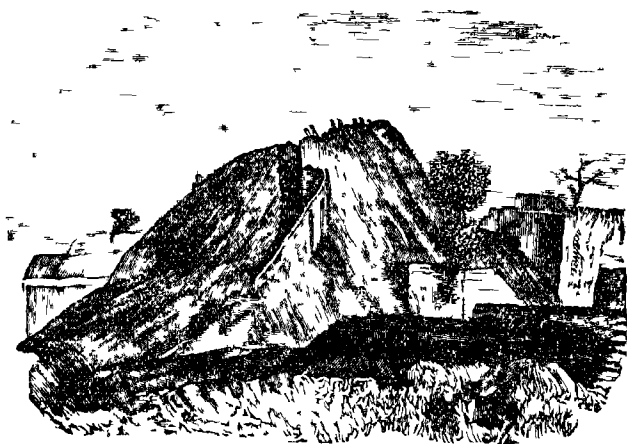
লর্ড উইলিযম বেণ্টিঙ্ক—ইহাব ন্যায মহামনা গবর্ণব এদেশে অতি অল্পই আসিয়াছেন। ইনি যুদ্ধবিগ্রহ কবিয়া বাজ্য বিস্তাব করে নাই বটে, কিন্তু প্রজাদিগেব কল্যাণেব জন্য যে সকল শুভ কার্য্যেব সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহাব জন্য ভাবতবাসী মাত্রই কৃতজ্ঞ অন্তবে চিবদিন তাঁহাব নাম স্মবণ কবিবে।

এখন দেশে কত বড বড বাঙ্গালী ডাক্তাব দেখিতেছ। বেণ্টিঙ্কই ইহাদিগেব উন্নতিব পথ খুলিযা দিয়াছিলেন। তিনিই কলিকাতাব মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙ্গালী ডাক্তাবেবা সকলেই এজন্য বেণ্টিঙ্কেব নিকট কৃতজ্ঞ। বেণ্টিঙ্ক কেবল যে মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা নয। ইংবেজী শিক্ষা প্রচলন ও উচ্চ শিক্ষা বিস্তাব কবিয়া, তিনি আমাদিগেব দেশেব লোকেব জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন। এই যে আজ এম, এ; বি, এ, উপাধি-

খাবী বিদ্বান্ যুবাদিগকে দেখিতেছ—যাহারা জ্ঞানলাভ করিয়া কত সুখী—বেণ্টিঙ্কই ইহাদিগের উন্নতির পথ খুলিয়া দিয়াছেন। বেণ্টিঙ্ক যে কেবল এদেশের লোকের শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নয়। সকল প্রকার কুরীতি, কুনীতি ও অন্যায় দেশাচার যাহাতে রহিত হয়, প্রাণপণে সেই চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, পূর্ব্বে আমাদের দেশের মেয়েরা স্বামীর মৃত্যু হইলে, স্বামীর সহিত চিতায় পুড়িয়া মরিতেন। বহুকাল হইতে এই প্রথা আমাদের দেশে চলিয়া

বেণ্টিঙ্ক।

আসিতেছিল। অনেক সতী যথার্থই অম্লানবদনে ও অকাতরে স্বামীর সহিত পুড়িয়া মরিতেন, এবং দেশের লোকেরা তাঁহাদিগকে সতীলক্ষ্মী বলিয়া দেবতার মত পূজা করিত। অনেক স্ত্রীলোক এইরূপ আদর ও সম্মান পাইবার ইচ্ছায় বা অন্য কোন কারণে স্বামীর সহিত পুড়িয়া মরিতে চাহিতেন। কিন্তু শেষে আগুনের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া

উঠিয়া পলাইতে চেষ্টা করিলে লোকেরা শুনিত না, বাঁশ দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রাখিত। এইরূপে এক প্রকার জোর করিয়া অনেক বিধবাকে হত্যা করা হইত। বেণ্টিঙ্কের এই দেশাচার ভয়ানক বলিয়া বোধ হইল। তিনি বিধবাদিগের স্বামীর চিতানলে পুড়িয়া মরিবার রীতি রহিত করিলেন।

এই সকল সংকার্য্য করিয়া, বেণ্টিঙ্ক আমাদের সকলেরই প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। এই সকল সাধু কার্য্যে বেণ্টিঙ্কের সহিত আর একজন দেশীয় মহাপুরুষের নাম জড়িত। তিনি কে জান? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। সতীদাহ নিবারণ ও ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনের জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং লর্ড বেণ্টিঙ্ককে বিস্তর সাহায্য করিয়াছিলেন।

সেকালে বাঙ্গালাদেশে ডাকাতদিগের বড় অত্যাচার ছিল। তোমরা হয়ত ডাকাতদিগের গল্প কত শুনিয়াছ। "ঠগী" বলিয়া একদল ডাকাত ছিল। তাহারা ছদ্মবেশে পথিকদিগের সহিত জুটিয়া পথে যাইতে যাইতে হঠাৎ তাহাদিগের গলায় ফাঁসি দিয়া মারিয়া ফেলিত, এবং তাহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইত। লর্ড বেণ্টিঙ্ক প্রজাদিগকে ঠগীর অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কাপ্তেন শ্লিমানের চেষ্টায় কয়েক বৎসরের মধ্যে ১৫৬২ ঠগ ধরা হয়। ঠগেরা নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সঙ্গীদিগকে ধরাইয়া দিত, এই প্রকারে ঠগেরা অনেকেই ধরা পড়ে।

বেণ্টিঙ্কের সময় রাজ্য বিস্তারের মধ্যে কেবল হিন্দুরাজ্য "কুর্গ" ইংরেজ অধিকারে আইসে। তাহাও বেণ্টিঙ্ক ইচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করেন নাই। কুর্গের রাজা বীররাজ প্রজাদিগের উপর ভয়ানক অত্যাচার করেন। তাহাতে প্রজারা ইচ্ছাপূর্ব্বক ব্রিটিশরাজের নিকট আত্ম সমর্পণ করে।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের পর লর্ড মেটকাফ কিছু দিনের জন্য গভর্ণর হন। তিনি এদেশের মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা দিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া আছেন। ইনিও ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র।

লর্ড অকল্যাণ্ড—(১৮৩৬—৪২ খৃঃ অঃ) ইঁহার সময়ে কাবুলে প্রথম যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধের ফল অতি শোচনীয়। এবং সেই সময় হইতে ভারত সীমান্তে যে যুদ্ধের বীজ রোপণ করা হইয়াছে, তাহার ফল আজও ফলিতেছে।

কাবুল যুদ্ধের কারণ—পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে যিনি মারাঠাদিগকে পরাজিত করেন, সেই প্রসিদ্ধ আহমদ সা দুরাণিকে তোমাদিগের হয় ত মনে আছে। লর্ড অকল্যাণ্ডের সময় ইঁহার বংশধর শাহ সুজা নামে এক ব্যক্তি পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া, অতি কষ্টে দিনপাত করিতে ছিলেন। এমন কি কাশ্মীরের রাজা একবার তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন। আহমদ শাহ দুরাণি দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে যে "কোহিনুর" লইয়া যান এবং যাহা এখন আমাদের মহারাজার মুকুটে শোভা পাইতেছে, সেই কোহিনুর তখন শাহ সুজার নিকট ছিল। কাশ্মীররাজ তাহা লইতে চেষ্টা করিয়া পান নাই। পরে শাহ সুজা কিছু দিনের জন্য রণজিৎ সিংহের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি শাহ সুজার নিকট হইতে কোহিনুর লন। এই ব্যক্তিকে লইয়াই ইংরেজদিগের কাবুলে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল। যে ব্যক্তি শাহ সুজাকে তাড়াইয়া, কাবুলে আমীর হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম দোস্ত মহম্মদ। পঞ্জাবরাজ রণজিৎ সিংহ দোস্ত মহম্মদের নিকট হইতে পেশওয়ার কাড়িয়া লন। দোস্ত মহম্মদ পেশওয়ার উদ্ধার করিয়া দিবার জন্য ইংরেজরাজকে অনুরোধ করেন। কিন্তু রণজিৎ সিংহের সহিত মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ থাকায়, তাঁহারা এ বিষয়ে কিছু করিতে অস্বীকৃত

হন। কাজেই দোস্ত মহম্মদ মনে মনে ইংরেজদিগের উপর মহা বিরক্ত হইলেন। এদিকে রুশিয়া পশ্চিম হইতে এশিয়া জয় করিতে করিতে, ভারতের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। ইংরেজদিগের আতঙ্ক হইল, পাছে বা কাবুলের আমাকে আক্রান্ত করিয়া, রুশিয়া ভারতে প্রবেশ করে; এবং এইরূপ ভয় করিবার যে কোন কারণ ছিল না তাহা নয়। কাজেই লর্ড অকল্যাণ্ড কাবুলের আমীরের সহিত বন্ধুতা করিবার জন্য দোস্ত মহম্মদের সভায় একজন ইংরেজ দূত পাঠাইলেন। সেই সময় দোস্ত মহম্মদের সভায় একজন রুশীয় দূতও ছিলেন। দোস্ত মহম্মদ মনে মনে ইংরেজদিগের উপর বিরক্ত ছিলেন। এখন তিনি প্রকাশ্য ভাবে রুশীয় দূতকে সমাদর করিয়া ইংরেজ দূতকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। গভর্ণর জেনারেল কাবুলে রুশিয়ার প্রভাব দমন করা একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। দোস্ত মহম্মদকে তাড়াইয়া শাহ সুজাকে কাবুলের আমীর করিবার জন্য রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। লর্ড অকল্যাণ্ড অচিরে দোস্ত মহম্মদের বিরুদ্ধে রণ ঘোষণা করিলেন। বম্বে ও বাঙ্গালাদেশ হইতে সৈন্য সকল আফগানিস্থানে প্রেরিত হইল (১৮৩৪ খৃঃ অঃ) কান্দাহার, কাবুল, গজনি ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। দোস্ত মহম্মদ পরাজিত হইলেন। দোস্ত মহম্মদ ইংরেজরাজের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিলে, তাঁহাকে প্রচুর বৃত্তি দিয়া ভারতবর্ষে বন্দীভাবে রাখা হইল। বাহিরে শান্তি হইল বটে, কিন্তু অন্তরে অন্তরে আফগানগণ ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে আস্ফালন করিতে লাগিল। শাহ সুজা আফগানদিগের প্রিয়পাত্র ছিলেন না। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। যে বিদ্বেষের আগুন গুপ্তভাবে হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বলিতেছিল, হঠাৎ তাহা মহাতেজে জ্বলিয়া উঠিল। আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া কাবুলের ইংরেজদিগকে আক্রমণ করিল। সার এলেকজন্দর বার্ণস,

সার উইলিয়ম্ মেগনেটন বিদ্রোহীদিগের হস্তে প্রাণ হারাইলেন। বিদ্রোহীরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং ইংরেজ সৈন্যগণ অসহায় হইয়া পড়িল। তাহারা নিরাপদে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবার আশায় বন্দুক ও অর্থ বিদ্রোহীদিগের হস্তে সমর্পণ করিল। কিন্তু তাহারা শিবির ছাড়িয়া দুই পদ না যাইতে যাইতে আফগানেরা তাহাদিগকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল। তখন আবার দুরন্ত শীত, পথে শীতে, অনাহারে, এবং আফগানদিগের প্রহারে শত শত লোক পড়িতে লাগিল। সেই সময়ে সৈন্যদিগের যে দারুণ যন্ত্রণা হইয়াছিল, তাহার বর্ণনা অসাধ্য। ১৫০০০ ব্রিটিশ সৈন্য ভারতবর্ষের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু কেবলমাত্র একজন মৃতপ্রায় অশ্বারোহী ইংরেজ এই নিদারুণ সংবাদ দিবার জন্য জলালাবাদে উপস্থিত হইল। লর্ড অকল্যাণ্ড এ সংবাদে শোকে মুহ্যমান হইলেন। এদেশে ইংরেজদিগের ভাগ্যে এমন দুর্ঘটনা কখনও ঘটে নাই।

লর্ড এলেনবরা— ১৮৪২—৪৪ খৃঃ অ) কাবুলের এই ঘটনাতে

আফগানিস্থানের খাইবার পাশ।

বিলাতের কর্তৃপক্ষেরা লর্ড অকল্যাণ্ডের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে লর্ড এলেনবরাকে গভর্ণর করিয়া পাঠাইলেন। তিনি এদেশে আসিয়াই আফগানিস্থানে এই ঘোর দুর্ঘটনার প্রতিশোধ লইয়া ইংরেজ নামের গৌরব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য কাবুলে সৈন্য পাঠাইলেন। ইংরেজ সৈন্য খাইবার পাশ দিয়া আফগানিস্থানে প্রবেশ করিল। পথে আলি মসজিদ এবং অন্যান্য দুর্গ অধিকার করিল। অচিরে কাবুল হস্তগত হইল। যত ইংরেজ বন্দী মুক্তিলাভ করিল। ইংরেজেরা কাবুলের প্রকাণ্ড বাজার ভূমিসাৎ করিল। গজনীর দুর্গ চূর্ণ বিচূর্ণ করিল এবং বিদ্রোহীদিগকে জব্দ করিয়া ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে ফিরিল।

সিন্ধু যুদ্ধ—এই সময় পর্য্যন্ত সিন্ধু দেশের আমীরগণ স্বাধীন ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে আফগান যুদ্ধের সময় ইংরেজ-দিগকে সাহায্য করেন। কিন্তু কোন কোন আমীরের ব্যবহারে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের তাঁহাদিগের উপর সন্দেহ জন্মে। তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ভিতরে ভিতরে তাঁহারা সকলেই শত্রু-দিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতেছেন। তখন ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের রাজ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিলেন (১৮৪৩ খৃঃ অঃ)।

গোয়ালিয়ার যুদ্ধ—দৌলতরাও সিন্ধিয়ার পোষ্যপুত্র জনকজীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পত্নী তারাবাই ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে এক পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন, এখন সেই বালকের অভিভাবক হইবার জন্য তাহার মামা সাহেব ও দাদা সাহেব উভয়েই চেষ্টা করেন। ইংরেজেরা মামা সাহেবের পক্ষ ছিলেন। কিন্তু স্বয়ং রাণী দাদা সাহেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন। ইংরেজেরা দাদা সাহেবকে তাঁহাদের হস্তে দিবার জন্য বলেন। কিন্তু রাণী তাহাতে অস্বীকৃত হন। সুতরাং

ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। স্বয়ং গভর্ণর জেনারল যুদ্ধের নেতা হইলেন। মহারাজপুর পুন্নিয়ার যুদ্ধে সিন্ধিয়ার সৈন্য পরাজিত হইল। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট সিন্ধিয়ার সৈন্য সংখ্যা কমাইয়া দিলেন এবং ৩২টীর অধিক কামান রাখিবার অধিকার রহিত করিলেন। বালক সিন্ধিয়ার নাবালক অবস্থায় ইংরেজেরা তাঁহার অভিভাবকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জ—(১৮৪৪—৪৮ খৃষ্টাব্দ) লর্ড এলেনবরার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ গভর্ণর হইয়া আসিলেন। ইহার সময়ে প্রথম শিখ যুদ্ধ হয়।

মহারাজ রণজিৎসিংহ অতিশয় সুযোগ্য ও শক্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার অধীনে শিখ সৈন্য এক প্রবল শক্তি হইয়া উঠে। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যে ঘোর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা উপস্থিত হইল। রণজিৎ সিংহের যে কয় জন সুযোগ্য সেনাপতি ছিল, তাহার মৃত্যুর পর একে একে তাহাদিগের সকলের মৃত্যু হয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়্গ সিংহ পঞ্জাবের রাজা হইলেন। খড়্গ সিংহ ও তাঁহার পুত্র নিওনিহাল সিংহের মৃত্যু হইলে, রণজিৎ সিংহের দ্বিতীয় পুত্র শের সিংহ রাজা হন এবং দান সিং তাঁহার উজীর নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু অচিরে দান সিংহের সহিত শের সিংহের বিবাদ উপস্থিত হইল। কারণ দান ইংরেজদিগের ঘোর শত্রু ছিলেন। কিন্তু শের সিংহের সে ভাব ছিল না। দান বিদ্রোহী হইয়া শের সিংহকে হত্যা করেন এবং নিজেও ত্বরায় নিহত হইলেন। তখন দান সিংহের ভ্রাতা হিরা সিং রণজিৎ সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র দলীপ সিংহকে পঞ্জাবের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

তখন দলীপ দশ বৎসরের বালক। হিরা সিং স্বয়ং তাঁহার উজীর হইলেন। শিখসৈন্যদিগকে খালসা বলিত। এই খালসাগণ এমন দুর্দ্ধর্ষ, এমন তেজস্বী ও এমন যথেচ্ছাচারী ছিল যে, বলিতে গেলে

শিখসৈন্য—খালসা।

রাজ্যমধ্যে তাহারাই প্রবল শক্তি ছিল। ইহাদিগের উপদ্রবে দলীপের জননী রাণী ঝিনন্দ ও উজীর সর্ব্বদাই শশব্যস্ত থাকিতেন। হিরা সিং সাধ্যমতে খালসাদিগের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার ফল এই হয়, খালসাদিগের হস্তে তিনি প্রাণ হারাইলেন। তখন রাণী লাল সিং নামে একজন ব্রাহ্মণকে উজীর করিলেন। কাবুলে ইংরেজদিগের লাঞ্ছনার পর হইতেই শিখ সৈন্যগণ ইংরেজ সৈন্যদিগের সহিত বাহুবল পরীক্ষা করিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া উঠে। লাল সিংহ তাহাদিগকে নানা প্রকারে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহাদিগের দুর্দ্দমনীয় রণপিপাসা কিছুতেই শান্ত হইল না। সৈন্যগণ রাজ্যের ঘোর অশান্তির কারণ। তখন রাণী ও উজীর মহাশয় আর অন্য উপায় না দেখিয়া, খালসাদিগকে ইংরেজরাজ্য আক্রমণ

করিবার অনুমতি দিলেন। তাহারাও ঘোর রবে ইংরেজ অধিকারে প্রবেশ করিল। এইরূপে খালসাদিগের অত্যাচারে প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ভ হয় (১৮৪৫ খৃঃ অঃ)। মুদকি, ফিরোজ সহর, আলিওয়াল ও সোব্রাও নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে যদিও অবশেষে শিখসৈন্য পরাস্ত হয়, কিন্তু ইংরেজ পক্ষ সহজে যুদ্ধে জয়ী হইতে পারেন নাই। যুদ্ধে বিস্তর ইংরেজ সৈন্য নষ্ট হয়। ভারতবর্ষে ইংরেজেরা অনেক যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ কখন করেন নাই। ইংরেজেরা শতদ্রু পার হইয়া লাহোরের অদূরে মিয়ানমির নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গোলাপ সিং ইংরেজদিগের নিকট সন্ধির প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধির ফল এই হইল যে, পঞ্জাবরাজ শতদ্রু ও বিপাশার মধ্যবর্ত্তী দেশ ইংরেজদিগকে ছাড়িয়া দিলেন; এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ কোম্পানিকে দেড় কোটি টাকা দিতে চাহিলেন। কিন্তু রাজকোষে তত টাকা না থাকাতে গোলাপ সিংহকে এক কোটি টাকায় কাশ্মীর বিক্রয় করিলেন। এখন পর্য্যন্ত এই গোলাপ সিংহের বংশধরেরা কাশ্মীরে রাজত্ব করিতেছেন।

লর্ড ডালহৌসী— ১৮৪৮—৫৬ খৃঃ অঃ) লর্ড ডালহৌসী গভর্ণর হইয়া আসিবার ছয় মাস পরেই দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ আরম্ভ হয়।

মুলতানের শাসনকর্ত্তা মূলরাজ পঞ্জাবরাজের অধীন ছিলেন। তিনি যখন ঐ পদ প্রাপ্ত হন, তখন পঞ্জাবরাজকে ১,৮০,০০০ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাহা পরিশোধ না করায়, ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ঋণ শোধ করিবার জন্য মূলরাজকে বার বার অনুরোধ করেন। তাহাতে মূলরাজ পদত্যাগ করেন। ইংরেজেরা তখন ঐ পদে আর এক ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং এই নূতন শাসন-কর্ত্তাকে লইয়া একদল ইংরেজ সৈন্য মুলতানে যাত্রা করে। মূলরাজ প্রকাশ্যে ইঁহাদিগের হস্তে সহরের চাবি দিলেন বটে, কিন্তু

সেই রাত্রেই বিদ্রোহী হইয়া ইংরেজ সৈন্যদিগকে আক্রমণ করিলেন। ওদিকে লাহোর হইতে ইংরেজদিগের সাহায্যার্থ শের সিংহের অধীনে একদল সৈন্য আসিতেছিল, তাহারাও বিদ্রোহী হইল।

শের সিংহ এবং তাহার পিতা ছত্র সিংহ উভয়েই ইংরেজদিগের ঘোর শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। এমন কি ছত্র সিং পেশওয়ার ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া, দোস্ত মহম্মদকে পর্য্যন্ত আপনাদিগের সহায় করিয়া লইলেন। আবার শিখদিগের সহিত ইংরেজ সৈন্যের রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হয়। চিলিওয়ানআলা গ্রামে প্রথম শিখ যুদ্ধ (১৮৪৯ খৃঃ অঃ) হয়। তাহাতে শিখসৈন্যই জয়যুক্ত হয়। কিন্তু তাহার পরে গুজরাটে আর এক যুদ্ধ হইল, তাহাতে শিখেরা একেবারে পরাজিত হয়। শের সিং এবং তাঁহার শিখ সেনাপতিগণ ১৬,০০০ অতি উৎকৃষ্ট খালসা সৈন্য লইয়া ইংরেজ সেনাপতির হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন। যুদ্ধের ফল হইল যে, পঞ্জাব ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হইল। পঞ্জাব অধিকার করিয়াই ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট সমুদায় শিখদিগকে নিরস্ত্র করিলেন। শিখ বীরগণ একে একে যখন অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিল, তখন চক্ষের জলে তাহাদিগের বুক ভাসিয়া যাইতেছিল। সেই দৃশ্য দেখিয়া বিজয়ী ইংরেজগণ পর্য্যন্ত দুঃখে বিস্মিত হইয়াছিলেন। মহারাজ দলীপ সিংহ ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া বিলাতে গমন করিলেন।

পঞ্জাব অধিকৃত হইল, তাহার সুশাসন ও সুবন্দোবস্তের ভার সার্ হেন্‌রি লরেন্সের উপর ন্যস্ত হয়। ইনি অতি সুযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। রাস্তা নির্ম্মাণ, স্কুল স্থাপন প্রভৃতি সৎকার্য্যের দ্বারা এই অল্প সময়ের মধ্যেই পঞ্জাবের শ্রী একেবারে ফিরিয়া গিয়াছে। রণজিৎ সিংহের যে প্রমত্ত রণপিপাসু সৈন্যগণ আপনাদিগের এবং অপরের রাজ্যের ভীতি স্বরূপ ছিল, তাহারা এখন ব্রিটীশ রাজ্যের প্রধান বল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ—শিখযুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই আবার ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্রহ্মদেশে যে ইংরেজ রেসিডেণ্ট ছিলেন, তাঁহার প্রতি ব্রহ্মরাজ এমন ব্যবহার করেন যে, তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। রেঙ্গুণের ইংরেজ বণিকদিগের প্রতি মগ শাসনকর্ত্তা অত্যন্ত মন্দ ব্যবহার করেন। গভর্ণর জেনারল মগরাজকে তাহার প্রতিবিধান করিতে বলিলে তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করেন নাই, এই কারণেই দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে মগরাজ পরাজিত হইলেন, এবং মার্টাবান, রেঙ্গুন, বেসিন, প্রোম, পেগু ইংরেজদিগের হস্তগত হইল। ব্রহ্মবাসিগণ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়া স্বচ্ছন্দে আছে, এবং তখন হইতে ব্রহ্মদেশের শ্রী ফিরিয়া গিয়াছে।

লর্ড ডালহৌসির সময় শুধু পঞ্জাব এবং ব্রহ্মদেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত হয়, তাহা নহে। সেতারা, ঝান্সী, নাগপুর, বিরার এবং অযোধ্যা ইংরেজ রাজ্যের অন্তর্গত হইল। বিরার, সেতারা, ঝান্সী এবং নাগপুরের রাজাদিগের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হওয়াতে, ডালহৌসি এ সকল দেশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ অনেক দিন হইতে অতি অযোগ্যতার সহিত রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। পূর্ব্বের গভর্ণরগণ তাঁহাকে বার বার সাবধান করিয়া দেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। অবশেষে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করিয়া, অযোধ্যা ইংরেজ-রাজ্যভুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। সেই অনুসারে ১৮৫৬ অব্দে অযোধ্যার ইংরেজ রেসিডেণ্ট জেনারল আউট্রামকে অযোধ্যার শাসনভার গ্রহণ করিতে বলিলেন। ওয়াজিদ আলি অশ্রুপূর্ণলোচনে বিনীতভাবে রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শিবপুর বাগানের পরপারে গঙ্গার ধারে মেটীয়াবুরুজের যে নবাবের বাড়ী দেখ,

তাহাই ওয়াজিদ আলি সার বাসভবন। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বৎসরে ১২ লক্ষ টাকা ওয়াজিদ আলি সার বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করেন।

লর্ড ডালহৌসী অতিশয় কর্ম্মঠ পুরুষ ছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে শুদ্ধ যে ইংরেজ রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হয়, তাহা নহে। তিনি রাজ্যের চতুর্দ্দিকে টেলিগ্রাফের তার ও রেলপথ বিস্তার এবং ডাকের সৃষ্টি করিয়া, প্রজাদিগের বিশেষ উপকার করেন। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড এবং অনেক সহর তাঁহার সময় নির্ম্মিত হয়। কিন্তু অযোধ্যার নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করাতে এবং সেতারা, ঝান্সী ও নাগপুর প্রভৃতি রাজপদ উঠাইয়া দেওয়াতে এদেশের লোকেরা তাঁহার সৎকার্য্যের কথা ভুলিয়া যায়। লর্ড ডালহৌসী ত রাজ্য বৃদ্ধি করিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার পরের গভর্ণর জেনারলকে কি রূপে সে রাজ্যবৃদ্ধির ধাক্কা সামলাইতে হইয়াছিল, তাহা পরে বলা যাইবে।

মহারাণীর রাজত্ব।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

১৮৫৭ আরল অব্ ক্যানিং	১৮৭৬ লর্ড লিটন্
১৮৬২ আরল্ অব্ এলগিন্	১৮৮০ মারকুইস্ অব্ রিপন
১৮৬৪ সার জন্ লরেন্স্	১৮৮৪ লর্ড ডফরিন্
১৮৬৯ আরল্ অব্ মেয়ো	১৮৮৭ লর্ড ল্যান্সডাউন
১৮৭২ আরল্ অব্ নর্থব্রুক্	১৮৯৩ লর্ড এলগিন্

১৮৯৯ লর্ড কার্জ্জন

লর্ড ক্যানিং—(১৮৫৬—৬২খৃঃঅঃ) লর্ড ডালহৌসীর পরে লর্ড ক্যানিং গভর্ণর জেনেরেল হইয়া এদেশে আসেন। তিনি যখন আসিলেন,

তখন দেশের চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছিল। "সিপাহী-বিদ্রোহ" নামক তুমুল ঝড় যে শীঘ্রই আসিতেছে, তাহা কেহ ভাবে নাই। লর্ড ক্যানিং অনেক সৎকার্য্য করিবেন ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু এই ঘোর বিপ্লবে তিনি এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, তিনি আর কোন দিকে মন দিতে পারেন নাই।

সিপাহী-বিদ্রোহ—(১৮৫৭ খৃঃ অঃ) সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক একশত বৎসর পূর্ব্বে ক্লাইব পলাশী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ভারতে ইংরেজ রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। একশত বৎসর পরে সিপাহী বিদ্রোহ নামক ঝড়ে ইংরেজ কোম্পানির ভারত সাম্রাজ্য টলমল্ করিয়া উঠিল। লড ডালহৌসী শাসন সময়ে এদেশে মহাপরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়। পুরাতন দেশীয় রাজ্য সকলের পরিবর্ত্তে চারিদিকেই ইংরেজ রাজ্য বিস্তৃত হয়। আবার রেলগাড়ী, পোষ্ট আফিস, টেলিগ্রাফ আফিস প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া, এ দেশের লোকদিগের মনে এক প্রকার বিস্ময়ের উদয় করে। চারিদিকেই পরিবর্ত্তন। পুরাতন যাহা কিছু ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে নূতন আসিয়া উপস্থিত হইল; হঠাৎ এত পরিবর্ত্তনের স্রোত সম্বরণ করা দেশের লোকের পক্ষে কিঞ্চিৎ কঠিন হইল। ওদিকে আবার দিল্লীর পুরাতন রাজবংশের কেহ কেহ ভারতবর্ষের নানা স্থানে ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে নানাকথা বলিয়া বেড়াইতেছিলেন, যত রাজ্যচ্যুত দেশীয় রাজারা, এবং শেষ পেশওয়ার পোষ্যপুত্র নানা সাহেব লুকাইয়া লুকাইয়া চারিদিকে ইংরেজ জাতির বিরুদ্ধে লোকের মনে বিদ্বেষের আগুন জ্বালাইয়া দিতেছিলেন। এই সকল কারণে এ দেশের লোকদিগের মনে হইল, বুঝি বা আমাদের চিরন্তন ধর্ম্ম কর্ম্ম আর থাকে না। বুঝি বা ইংরেজ কোম্পানি সকল উল্টাইয়া দেশটাকে বিলাত করিয়া ফেলেন! এই প্রকার কেমন একটা ত্রাসের ভাব সকলের মনের উপর আসিয়া পড়িল।

ওদিকে আবার বাঙ্গালার সিপাহীদিগের ভিতর একটা অসন্তোষের

ভাব পূর্ব্ব হইতেই দেখা দিয়াছিল। সিন্ধুদেশের যুদ্ধের সময় বাঙ্গালার সৈন্যগণ যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করে এবং ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের সময়ও সমুদ্র পার হইতে চাহে নাই। এইরূপে বাঙ্গালার সিপাহীরা যখন তখন আপনাদের ইচ্ছামত চলিতে চেষ্টা করিত।

বহরমপুরের সিপাহীরা প্রকাশ্যভাবে উচ্চ কর্ম্মচারীদিগের আজ্ঞা পালন করিতে অস্বীকার করায়, তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া বিদায় করা হয়। এই সময়ে আবার সিপাহীদিগের ভিতর নূতন বন্দুক প্রচলিত হওয়াতে সৈন্যদিগের ভিতর হুলস্থুল পড়িয়া যায়। সকলে বলিতে লাগিল নূতন বন্দুকের টোটায় শূকর এবং গরুর চর্ব্বি আছে। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যেরা সেই টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করিল। তাহাদিগকে কত বুঝাইয়া বলা হইল যে, বন্দুকের টোটায় চর্ব্বি আদৌ নাই, কিন্তু তাহারা কোনমতেই বুঝিল না। মিরাটের সিপাহীরা প্রথমে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইল। সেখানে এক দল সিপাহী টোটা ব্যবহার করিতে অস্বীকার করায় ৮৫ জন সিপাহীর প্রাণদণ্ড হয়। তাহাতে সমুদয় সিপাহী ক্ষেপিয়া উপরের কর্ম্মচারীদিগকে মারিয়া, জেল ভাঙ্গিয়া, সদলে দিল্লীতে উপস্থিত হইল। সেখানে গিয়া "পুরাতন মোগলরাজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হইল," এই কথা ঘোষণা করিল। মুসলমানেরা আসিয়া বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগ দিল। দিল্লী তখন বিদ্রোহীদিগের মিলনের ক্ষেত্র হইল। চারিদিক্ হইতে দলে দলে বিদ্রোহী সিপাহীগণ দিল্লীর দিকে আসিতে লাগিল এবং প্রায় একই সময় ২৪টা সহরে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। দলে দলে সিপাহীরা উন্মত্ত হইয়া চুই চক্ষে যত ইংরেজ দেখিল, সকলকে হত্যা করিতে লাগিল। বিদ্রোহের সূচনা দেখিয়া কর্তৃপক্ষেরা শিখ সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়াছিলেন। ফিরোজপুর, মুরদাবাদ, বরেলি, সাহারণপুর, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া, ধনাগার লুণ্ঠন

ও ইংরেজদিগকে হত্যা করে। লক্ষ্ণৌ এবং কানপুরে সিপাহীরা যাহা করিয়াছিল, তাহা স্মরণ হইলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। নানাসাহেব কানপুরের নিকট বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতেন। তিনি কানপুরের বিদ্রোহী সিপাহাদিগের নেতা হইলেন। কানপুরে যত ইংরেজ ছিল তাহাদিগকে ১৯ দিন ধরিয়া সিপাহীরা অবরোধ করিয়া রাখিল; তাহারা

সিপাহী বিদ্রোহ, কানপুরের কূপ।

আশ্চর্য্য সাহস ও বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে আহারাভাবে নিতান্ত কষ্ট উপস্থিত হইলে, তাহারা নানার নিকট এলাহাবাদে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। নানার আদেশ পাইয়া দলে দলে বালক বালিকা, পুরুষ রমণী নৌকায় করিয়া যাত্রা করিল। কিন্তু তাহাদের নৌকা ছাড়িতে না ছাড়িতে, বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ডেরা সকলকে গুলি করিয়া মারিতে লাগিল। শিশু সন্তান ও ইংরেজ রমণীদিগকে অতি নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করিয়া, তাহাদিগের দেহ এক কূপে ফেলিয়া

দিল। কানপুরের সেই কূপটীর চারিদিকে এখন এক সুন্দর বাগান হইয়াছে, আর মৃত ব্যক্তিদিগের স্মরণার্থ কূপের উপর সুন্দর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইয়াছে। পঞ্জাবের চিফ্ কমিশনার সার্ জন লরেন্সের ক্ষিপ্রকারিতায় বিদ্রোহ অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়া গিয়াছিল।

দিল্লীতে প্রায় ৩০,০০০ বিদ্রোহী মিলিত হইয়াছিল। তিন মাস অবরোধের পরে, তবে ইংরেজ সৈন্য দিল্লীতে প্রবেশ করিতে পারে। সহরে প্রবেশ করার পরে ছয় দিন অনবরত যুদ্ধ চলিয়াছিল। বিদ্রোহীরা প্রত্যের বাড়ীর ছাতের উপর হইতে গুলি ছুড়িতে লাছিল। ছয় দিন যুদ্ধের পর তবে ইংরেজেরা সহর অধিকার করিতে পারিলেন। তখন জেনারেল উইল্সন আজ্ঞা দিলেন, যাহার হস্তে অস্ত্র দেখিবে, তাহাকেই হত্যা করিবে। সহর খুঁজিয়া বৃদ্ধ বাদসাহকে হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির হইতে বাহির করিয়া বন্দী করা হইল। আর তাঁহার দুই পুত্রকে গুলি করিয়া মারা হইল।

এইরূপে সর্ব্বত্রই বিদ্রোহীদিগকে দমন করা হইল। সকল দেশীয় সিপাহী যে বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল তাহা নহে। মান্দ্রাজ, বম্বে ও হায়দরাবাদের সিপাহীরা কিছু করে নাই। অযোধ্যার অনেক তালুকদার, লক্ষ্মৌ এবং অযোধ্যাবাসীরা অনেকেই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। ঝান্সীর রাণী, তাঁতিয়া টোপী ও নানা সাহেব এই তিনজন প্রধান ব্যক্তি বিশেষভাবে বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিলেন। ঝান্সীর রাণী বীর রমণীর মত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁতিয়া নানা সাহেবের সহিত মিলিত হইয়া, অনেক অত্যাচার করিয়া গোয়ালিয়রের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন। তাঁতিয়া অবশেষে ধরা পড়িয়াছিলেন; কিন্তু নানার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বিদ্রোহ দমন হইতে প্রায় দুই বৎসর সময় লাগিয়াছিল। যে সকল ব্যক্তি সাক্ষাৎভাবে বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, তাহাদিগের প্রাণদণ্ড হইল। যাহারা সাহায্য করিয়া-

সিপাহী বিদ্রোহের পর লর্ড ক্যানিং-এর দরবার।

ছিল, তাহাদিগকে দ্বীপান্তরিত করা হইল। বিদ্রোহ দমন করিবার সময় যাহাতে নিরপরাধেরা শাস্তি না পায়, সেই জন্য ক্যানিং বিশেষ আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন, তাই লোকে তাঁহাকে "দয়ার সাগর ক্যানিং" বলিত।

সিপাহীবিদ্রোহের ফল এই হইল যে, কোম্পানির রাজত্ব শেষ হইল। ইংলণ্ডের মহারাণী সেই সময় হইতে ভারতের সাম্রাজ্ঞী হইলেন। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা নবেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে ভারতের সর্ব্বত্র এক ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল। তাহাতে রাজা এদেশের প্রজাদিগের ধর্ম্ম এবং জাতিভেদের উপর হস্ত দিবেন না, এইরূপ বলা হইয়াছে।

লর্ড মেয়ো—(১৮৬৯—৭২ খৃঃ অঃ) ইহার শাসনসময়ে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটে নাই। মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ইহার সময়ে এ দেশে আসেন। প্রথম রাজদর্শন পাইয়া ভারতবাসীরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিল। লর্ড মেয়ো আন্দামানদ্বীপ দেখিয়া জাহাজে উঠিবার সময় শের আলি নামে এক ব্যক্তি তাঁহার বুকে ছোরা বসাইয়া দেয়। এ ব্যক্তি হত্যা অপরাধে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইয়াছিল।

লর্ড নর্থব্রুক—(১৮৭২—৭৬ খৃঃ অঃ) ইহার শাসনসময়ে বাঙ্গালা দেশে দুর্ভিক্ষ হয়। লর্ড নর্থব্রুক দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রাণপণে যত্ন করেন এবং রাজকোষ হইতে বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খৃঃ অব্দে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস্ এ দেশে আগমন করেন। ভাবী রাজার দর্শন পাইয়া প্রজারা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিল। তাঁহার সমাদরের জন্য সর্ব্বত্রই বিপুল আয়োজন হইয়াছিল।

লর্ড লিটন্—(১৮৭৬-১৮৮০ খৃঃ অঃ) ইনি গভর্ণর জেনেরেল হইয়া আসিবার কিছু দিন পরে, দিল্লীতে সমারোহের সহিত এক দরবার

হয়। তাহাতে মহারাণী ভিক্টোরিয়া "ভারতেশ্বরী" এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় কাবুল যুদ্ধ—কাবুলের আমীরের সহিত তাঁহার পুত্রের কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট মধ্যস্থ হইয়া তাঁহাদিগের বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করেন। তাহাতে আমীর অতিশয় বিরক্ত হন। পরে লর্ড লিটন্ তাঁহার সভায় এক জন দূত পাঠাইলেন, তিনি তাঁহাকে রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকৃত হইলেন। ইহাতে গভর্ণর জেনারেল অতিশয় রুষ্ট হইয়া, আমীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইংরেজ সৈন্য বিনা বাধায় আফগানিস্থানে প্রবেশ করিল। আমীর রাজ্য ছাড়িয়া পালাইলেন; কিন্তু অচিরে তাঁহার মৃত্যু হইল। ইংরেজেরা তাঁহার পুত্র ইয়াকুব খাঁকে আমীর করিয়া, তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। তাঁহার সভায় স্থায়ীরূপে একজন ইংরেজ রেসিডেণ্ট থাকিবেন স্থির হইল। অল্প দিন পরেই আফগানেরা আবার ইংরেজ রেসিডেণ্টকে হত্যা করিল। আবার যুদ্ধ বাধিল। নূতন আমীর পদ ত্যাগ করিয়া, ভারতবর্ষে আসিলেন। আফগানদিগকে পরাজিত করিয়া, ইংরেজ সৈন্য ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিল।

লর্ড লিটনের সময় দাক্ষিণাত্যে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। প্রজাদিগের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিলেও বিস্তর লোক অনাহারে মারা যায়।

লর্ড লিটন্ দেশীয় খবরের কাগজের স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা লোপ করিয়া এ দেশের লোকের অতিশয় অপ্রিয় হইয়াছিলেন।

লর্ড রিপণ—(১৮৮০—৮৪ খৃঃ অব্দে) এইবার যাঁহার নাম করিতেছি, তাঁহার মত প্রজাপ্রিয় প্রজাহিতৈষী গভর্ণর এ দেশে অতি

অল্পই আসিয়াছেন। তিনি ভারতবাসীদিগের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহার জন্য চিরদিন এদেশের লোক তাঁহাকে স্মরণ করিবে। এ দেশের লোকেরা যাহাতে আপনাদিগের শাসনকার্য্যে অধিক ক্ষমতা লাভ করে, তিনি সেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। এ দেশের লোকদিগের ভিতর যাহাতে শিক্ষা অধিক বিস্তৃত হয়, সে চেষ্টাও তাঁহার ছিল।

লর্ড ডফরিন—(১৮৮৪—৮৮ খৃঃ অঃ) পাঠক পঠিকাগণ তোমাদের হয় ত মনে আছে, ডালহৌসির সময়ে দ্বিতীয়বার ব্রহ্ম যুদ্ধ হয়। তখন পেগু, প্রোম প্রভৃতি ব্রহ্মদেশের অনেক স্থান ইংরেজেরা অধিকার করেন। ব্রহ্মরাজ উত্তরে রাজত্ব করিতে থাকেন। লর্ড ডফরিনের সময় ব্রহ্মরাজ্যে থিবো প্রজাদিগের এবং পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের উপর অতিশয় অত্যাচার করিয়াছিলেন। কেবল ইহা নয়, ইংরেজ বণিকদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদ করিয়াছিলেন। এই কারণে ডফরিন ব্রহ্মরাজের সহিত যুদ্ধকরাই স্থির করিলেন, কিন্তু যুদ্ধ করিতে হয় নাই। বিনা যুদ্ধে ইংরেজেরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিলেন এবং থিবোকে বন্দী করিয়া মান্দ্রাজে আনিয়া রাখিলেন। রাজা বন্দী হইলেন বটে কিন্তু মগেরা সহজে বশ্যতা স্বীকার করিল না। সম্মুখ যুদ্ধে না পারুক তাহারা লুকাইয়া লুকাইয়া, ইংরেজের অনেক শত্রুতা করিয়াছে।

১৮৮৭ খৃঃ অব্দে মহারাণীর পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হওয়াতে অতি সমারোহের সহিত জুবিলি উৎসব হয়, তাহা হয়ত তোমাদের মনে আছে।

লর্ড ল্যান্সডৌন—ইঁহার সময়ে মণিপুর যুদ্ধ হয়। মণিপুর যদিও অতি ক্ষুদ্র রাজ্য, কিন্তু তাহার রাজারা বহুকাল হইতে স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে রাজা চন্দ্রকীর্ত্তির মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র শূরচন্দ্র রাজা হন। কিন্তু শূরচন্দ্রের বৈমা ত্রেয়

ভ্রাতা সেনাপতি টেকেন্দ্রজিৎ তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, সহোদর কুলচন্দ্রকে রাজা করিতে চেষ্টা করেন এবং আসামের চিফ্‌কমিশনার ও আর ৪ জন ইংরেজকে হত্যা করেন। এই অপরাধে অচিরে ইংরেজ সৈন্য মণিপুর অধিকার করিল। টেকেন্দ্রজিতের প্রাণ দণ্ড হইল। ইংরেজেরা চন্দ্রচূড় নামে রাজবংশের একজনকে রাজা করিলেন এবং একজন ইংরেজ রাজ্যের তত্ত্বাবধায়ক হইলেন।

লর্ড এলগিন—ইঁহার শাসন সময়ে এদেশের উপর দিয়া অনেক বিপদ স্রোত বহিয়া গিয়াছে। মহামারীতে বোম্বাই অঞ্চল বড়ই যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছে। ১৮৯৭ সালে ভারতবর্ষে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ বৎসর জুন মাসে এমন ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছিল, যাহা স্মরণ করিলে লোকে এখনও পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে। এ সকল ত গেল দৈব দুর্য্যোগ; ইহা ভিন্ন ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমায় ইংরেজদিগের সহিত পার্ব্বত্যজাতির যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। লর্ড এলগিন কিছু দিন হইল বিদায় লইয়াছেন এবং লর্ড কর্জ্জন তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

লর্ড কর্জ্জন—লর্ড এলগিন বিদায় লওয়াতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন তাঁহার পদে অভিষিক্ত হইয়া এদেশে আগমন করিয়াছেন। লর্ড কর্জ্জন সকল বিষয়েই অতি সুযোগ্য রাজপ্রতিনিধি। ইঁহার শাসন সময়ে ভারতবাসী দৈব দুর্য্যোগে নিতান্ত কাতর হইয়াছে। বঙ্গদেশ ব্যতীত বলিতে গেলে সমুদায় ভারতবাসী ভীষণ দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া দলে দলে প্রাণ হারাইতেছে। মহামনা লর্ড কার্জ্জন প্রজাগণের প্রাণ রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। প্লেগে ভারতের প্রজা অনেক ক্ষয় হইতেছে। লর্ড কার্জ্জন ভারতের পুরাতন কীর্ত্তি এবং স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য অতিশয় যত্নবান হইয়াছেন। এই সকল কারণে তিনি ভারতবাসীর আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পরিশেষে রাজরাজেশ্বরী ভারতের সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শোচনীয়

মৃত্যু উল্লেখ করিয়া পুস্তক শেষ করি। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী তিনি দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। ইঁহারই রাজত্ব সময়ে ভারতবর্ষ সুখ সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছে। ইঁহারই উদার শাসনগুণে ভারতের চারিদিকে শান্তি বিরাজ করিতেছে। সুতরাং ভারতের কোটি কোটি প্রজা রাজ্যেশ্বরীর মৃত্যুতে শোক-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছে। যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস্ এখন সপ্তম এডওয়ার্ড নামে ব্রিটীশ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছেন।

উপসংহার।

সুকুমারমতি পাঠকপাঠিকাগণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস শেষ হইল। আমাদের এই দেশের উপর দিয়া কত ঘটনার স্রোত বহিয়া গিয়াছে, তোমরা তাহার বিবরণ কিছু কিছু শুনিলে।

মুসলমান অধীনতায় ভারতবাসীরা অনেক অত্যাচার, অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতেন সত্য; কিন্তু রাজারা হিন্দুদিগেকে অবজ্ঞার চক্ষে কখনই দেখিতেন না। কারণ মুসলমানগণ হিন্দুদিগের অপেক্ষা বাহুবলে শ্রেষ্ঠ হইলেও পাণ্ডিত্য কিম্বা সভ্যতায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন না। বিজেতৃগণ উন্নত হইলে বিজিতদিগের অনেক কল্যাণ হয়। কিন্তু মুসলমান অধীনতায় ভারতবাসীদিগের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। বরং জাতীয় জীবন ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘোর অবসন্নতার দিনে মারাঠা এবং শিখগণ নূতন শক্তিতে জাগিয়া উঠিলেও, তাহাতে এ দেশের কল্যাণ হয় নাই। তাহার পর কিরূপে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ইংরেজেরা ক্রমে আমাদের দেশের রাজা হইলেন, তাহাও তোমরা শুনিয়াছ। আজ প্রায় তিন শত বৎসর হইতে চলিল, ইংরেজেরা

বাণিজ্যের জন্য এদেশে পদার্পণ করেন, এবং প্রায় দেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা না করিয়া, বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিয়াছিলেন। তখন ভারতে শক্তি-সংগ্রাম চলিতেছিল। মারাঠা, শিখ, নূতন মুসলমান রাজারা, প্রত্যেকেই জয়যুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন। ইংরেজ এবং ফরাসীরা প্রথমে কেবল আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া, শেষে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু যে সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত হয়, জয় তাহারই। ভারতে ইংরেজেরা সে কথার জীবন্ত সাক্ষ্য দিতেছেন। বর্ত্তমান সময় পৃথিবীতে ইংরেজদিগের মত শ্রেষ্ঠ জাতি বোধ হয় আর নাই। ভারতের ঘোর দুর্দ্দিনে ভারতবাসীরা এই উন্নত শক্তিশালী জাতির আশ্রয় লাভ করিয়া রক্ষা পাইয়াছে। বহুদিনের পরাধীনতায় ভারতবাসীরা এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, অন্য কোন প্রবল শক্তির আশ্রয় ভিন্ন আর গতি নাই। তাই বলিতেছি, শুভক্ষণেই ইংরেজেরা এদেশে আসিয়াছিলেন। ভারত ব্যাপিয়া যে অরাজকতা, যে অত্যাচার ছিল, আজ তাহার পরিবর্ত্তে, দেখ, ভারতময় কেমন শান্তি, কেমন শৃঙ্খলা কেমন সৌন্দর্য্য বিরাজ করিতেছে। মধ্যভারতে যেখানে ঘোর অরণ্য ছিল, আজ দেখ, সেখানে সুন্দর শ্যামল শস্যক্ষেত্র; জনহীন পল্লীগ্রাম সকল, দেখ, এখন ধনে জনে পূর্ণ সহর হইয়াছে; পূর্ব্বে লোকে জীবনের আশা ত্যাগ করিয়া বিদেশে যাত্রা করিত, পথে কত দস্যু, কত বিপদ; আজ রেল-গাড়ীতে উঠিয়া নিরাপদে, আনন্দে, আরামে ছয় মাসের পথ লোকে ছয়দিনে যাইতেছে। বিপদে পড়িলে দূরদেশে প্রিয়জনদিগের নিকট এক দণ্ডের মধ্যেই সংবাদ পাঠাইতেছে। দুএক পয়সা দিলেই ভারতের অপর প্রান্তে তোমার পত্রাদি যাইতেছে। দেখ, গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, কত বিদ্যালয়, কত পাঠশালা! ভারতবাসিগণ বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া ধন্য হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকেরা ধন প্রাণ লইয়া, নিরাপদে বাস করিতে পারিত না; সবলেরা নিয়ত দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিত; আমাদিগের বর্ত্তমান রাজাদিগের কৃপায় সর্ব্বত্রই দুষ্টের শাসন ও অত্যাচারের প্রতীকার হইতেছে। ইংরেজ রাজত্বে ভারতবাসীরা আরও কত উপকার লাভ করিয়াছে। এ সকলের জন্য আমরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করি।

প্রশংসা পত্র।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী প্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাস সমুদায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালা এবং ইংরাজী সংবাদ-পত্রে বিশেষ ভাবে প্রশংসিত হইয়াছে। নিম্নে তাহার দুই চারিটী মন্তব্য উদ্ধৃত হইল।—

The theme has been made so attractive that we venture to think most young students will look forward to the history hour —*Indian Magazine London.*

The authoress has made her book quite a pleasant reading to little boys and girls giving at the same time a full record of events. The get up is good, price is cheap. —*Amrita Bazar.*

শ্রীমতী হেমলতা দেবী যে ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, স্কুলের প্রচলিত সাধারণ ইতিহাস অপেক্ষা দুই কারণে তাহা শ্রেষ্ঠ; প্রথমতঃ ভাষা সরল, দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসের একটী চেহারা দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্রী প্রয়াস পাইয়াছেন। —"ভারতী"

পুস্তকখানির ভাষা এমন সরল ও সুমিষ্ট যে ইহার যে কোন পরিচ্ছেদ পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া নিবৃত্ত হওয়া যায় না * * * লেখিকা গ্রন্থখানিকে অতি সরল ও উপাদেয় করিয়াছেন।

—"বামাবোধিনী"

আমরা বালকবালিকাদিগের জন্য লিখিত যতগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাস দেখিয়াছি, এইখানি তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উদ্দেশ্যোপযোগী বলিয়া বোধ হইল। ইহার ভাষা সহজ, বিষয় নির্ব্বাচনও উত্তম।

— "প্রদীপ"

অতি সরল ও মধুর ভাষায় পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পড়িবার সময় মনে হয় যেন একখানি উপন্যাস পড়িতেছি।

—"নব্যভারত"

বালকবালিকাগণের বোধ সৌকর্য্যার্থে লেখিকা এইখানি সরল ভাষায় রচনা করিয়াছেন। অনেক বিষয়ে এই ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি সুন্দর হইয়াছে। ভাষা সরল ও সুপাঠ্য।

—"বসুমতী"